ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

সুসাহিত্যিক

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

করকমলে

১

ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্—

ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্—

ও ভালুক-অলা, এদিকে এসো, ও ভালুক-অলা, এখানে এ বাড়ীতে এসো।

লাল পথ ধরিয়া ভালুক-অলা চলিয়াছে। বাঁ হাতে ভালুকের নাকের দড়ি ধরিয়া ডান হাতে ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে বাজাইতে ভালুক-অলা চলিয়াছে ভালুকের পাশে পাশে। পিছনে পাড়ার একদল ছেলে জুটিয়া গিয়াছে, আরও পিছনে পাড়ার গোটা তুই কুকুর চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে। কুকুরের ডাকে বিরক্ত হইয়া ভালুকটা এক একবার মুখ ঈষৎ ঘুরাইয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে, গোটা কয়েক শাদা দাঁত দেখা যায়, ছেলেরা হটিয়া আসে, কুকুরগুলো অবশ্য অত দূর হইতে দেখিতে পায় না, তাই তাহাদের ডাক থামে না।

ও ভালুক-অলা, তুমি এ বাড়ীতে এসো না।

ভালুক-অলা দেখে বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটি মোটা সোটা ছেলে ডাকিতেছে। ভালুক-অলা থামে, দড়িতে টান পড়ে, ভালুকটা ঘাড় ফিরায়। ভালুক-অলা দেখিতে পায় বাড়ীর বারান্দায় একটি বাবু গায়ে মোটা কাপড় জড়াইয়া বসিয়া আছে। সে তখন ভরসা পাইয়া প্রাচীর-ঘেরা হাতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, বাবুটিকে এক দীর্ঘ সেলাম করিয়া দাঁড়ায়, ভালুকটা পিছনের তু’

পায়ে ভর দিয়া বসিয়া পড়িয়া সম্মুখের একখানা পা দিয়া নাক ঘসে।

বাবা ভালুক নাচ দেখাও।

আবার সকালবেলাতেই যত সব—

দেখাও না বাপু।

একটি বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী মহিলা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, দেখাও না বাপু, এখানে তো কোন কাজ নেই, তবু সময় কাটবে।

ভদ্রলোক, মহিলা ও ছেলেটি তিনজনেই স্থূল, মেদসাম্যে বুঝিতে কষ্ট হয়না, পিতা, মাতা ও পুত্র।

ভদ্রলোক নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, দেখাও কি আছে দেখাও, চটপট সেবে নাও।

হুকুম পাইয়া ভালুক-অলা দড়িতে টান দিল, ভালুক উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাড়ার একদল ছেলে মেয়ে বুড়ো চাবদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল, কুকুরগুলা সরিয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে ডুরে শাড়ী-পরা, দশ-বারো বছরের একটি গোলগাল মেয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াই থামিয়া গেল, ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, আরে নীলমণি কখন্ এলো।

গিন্নি বলিলেন, ও পাঁপড়ি, নীলমণি আবার কে ?

কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশ দোলাইয়া পাঁপড়ি বলিল—ঐ যে ভালুকটা।

ভালুকের আবার ও কি রকম নাম ?

তবু তো এখনো সব শোননি মা, ভালুক-অলার নাম কি জানো? নীলমণির বাপ।

সে আবার কিরে! তোদের দেশের সবই অদ্ভুত।

তা মা যে দেশের যেমন, ভালুকের নাম নীলমণি হ'লে ভালুক-অলার নাম তো নীলমণির বাপ হবেই।

এই বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, হাতের কাঁচের চুড়িগুলো ঠিনঠিন করে, কোঁকড়া চুলের বাশ চিকচিক করে, কৌতুকে-ভরা চোখ তুটা ঝিকমিক করে।

নে থাম্, তোর সব কথাতেই হাসি, ঐ দেখ্ নাচ আরম্ভ হয়েছে।

কিন্তু পাঁপড়ি ততক্ষণে বারান্দা হইতে নামিয়া ভালুকনাচের আসরে গিয়া উপস্থিত।

ও নীলমণি, দেখাও তো মেয়ে কি রকম ক'রে শ্বশুর বাড়ী যায়।

নীলমণির বাপ বলে, দেখাও বেটা দেখাও।

অমনি নীলমণি তুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ওঠে, অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে, পা যেন উঠিতেছে না, আর গুটি গুটি সম্মুখ দিকে চলে, আর মাঝে মাঝে সম্মুখের একখানা পা দিয়া অশ্রুমোচনের অভিনয় করে।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, পাঁপড়ির খিলখিল আওয়াজ সকলের উপরে।

এবার আবার পাঁপড়ি বলে, নীলমণি, দেখাও তো মেয়ে কি রকম ক'রে বাপের বাড়ী যায়।

দেখাও বাবা, দেখাও।

অমনি নীলমণির ভাবে ভঙ্গীতে পরিবর্ত্তন ঘটে। এতক্ষণ যে

কাপড়ের টুকরা ঘোমটার কাজ করিতেছিল সেখানা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, গট্ গট্ করিয়া হাঁটিতে স্থরু করে, আনন্দের যেন সীমা নাই।

আবার সকলে হাসিয়া ওঠে, আবার সকলের উপরে পাঁপড়ির হাসির খিলখিল।

ও পাঁপড়ি দিদি, তুমিই যদি সব দেখাবে আমি তবে কি করবো?

তুমি পয়সা কুড়োবে আর কি করবে!

তারপরে একটু থামিয়া শুধাইল, কি নীলমণিকে খেতে টেতে দাও না সবই তোমার পেট পূজোয় যায়। ওযে শুকিয়ে গেছে।

ও সন্তু, দেখ্‌তো তোর মাষ্টার মশাই কি করছেন, একবার ডেকে দে।

সন্তুকে ডাকিতে হইল না, পাশের ঘর হইতে একটি যুবক বাহির হইয়া আসিলেন, গায়ে বাদামী রঙের একখানা গরম চাদর, হাতে একখানা বই, পৃষ্ঠাঙ্কের ভাঁজে একটা আঙুল।

মাষ্টার মশাই সক্কাল বেলাতেই পড়তে বসেছেন! আর কি কাজ নেই, আস্থন ভালুকনাচ দেখা যাক।

সারদাবাবু, ভালুকনাচ আমার ভাল লাগে না।

কেন, কেন, বেশ নাচছে তো।

তা নাচছে বটে, কিন্তু বনের একটা স্বাধীন পশুকে নাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়ানো বড় নিষ্ঠুর।

আরে কেটে খাওয়ার চেয়ে তো ভালো!

বোধকরি তা-ও নয়। কেটে খেলে জ্বালা তখনি ফুরোয়, এ জ্বালা যে জীবন থাকতে যায় না। ও দেখ্‌তে বড় কষ্ট হয়।

যান তবে মাঠে ঘুরুন গে। আচ্ছা সঞ্জীববাবু, একা একা ঘুরে বেড়িয়ে কী সুখ পান? এখানকার ফাঁকা মাঠে দেখবার এতো কী আছে! হ'তো কল্‌কাতা সহর না হয় বুঝতাম।

সঞ্জীববাবু কোন উত্তর দিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, আপনারা দেখুন, আমি আসি।

সারদাবাবু নীরবে হস্তাঙ্গুলিতে একটা মুদ্রা করিলেন অর্থাৎ কত বিচিত্র জীবই না ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এবারে খেলা শেষ হইবার মুখে। গুরু মশায় কিভাবে ছাত্র ঠেঙান, পিতা কি ভাবে পুত্রের কর্ণমর্দ্দন করে, রজক কিভাবে বস্ত্রের বোঝা কাঁধে চলে প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য খেলাগুলি দেখিয়া দর্শকগণ মানব চরিত্র সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান লাভ করিয়াছে।

এবারে নীলমণির বাপ বলিতেছে, যাও তো বেটা রাজাবাবুর কাছে হাত জোড় ক'রে একখানা পাঁচটাকার নোট ভিক্ষে করো।

পাঁচটাকা না আস্ত একটা জমিদারি দিয়ে দেবে।

তুমি থামো না দিদি। এত বড়বাবু ফি বছর এখানে আসে না।

নীলমণি সোজা গিয়া সারদাবাবুকে সেলাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। পাছে অসভ্য জানোয়ারটা আরো কাছে আসে তাই তিনি তাড়াতাড়ি একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিলেন। নীলমণি কুড়াইয়া লইল, বারেক শুঁকিল, তারপর ফিরিয়া গিয়া ভালুক-অলার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

নাও এবার গেলো। কিন্তু ওকে যদি না খাইয়ে রাখো তো ভাল হবে না বলছি।

পাঁপড়ির কথা মানেই হাসি, না হাসিয়া সে কথা বলিতে পারে না, যেমন পারে না ঐ সুবর্ণরেখা নদী কলরোল না তুলিয়া প্রবাহিত হইতে।

যাও তো বেটা এবার রাণিমার কাছে থেকে একখানা শাড়ী চেয়ে নিয়ে এসো।

নীলমণি অনেককাল মানুষের সাহচর্য্য করিয়াছে তাই রাজা, রাণী, গৃহকর্ত্তা, গৃহিণী প্রভৃতি মান্যগণ্যদের অনায়াসে বুঝিতে পারে, আকৃতি দেখিয়া বোঝে, প্রকৃতি দেখিয়া বোঝে, ওজন আচার ও ব্যবহার দেখিয়া বোঝে। মানুষেই বা আর অন্য কি দেখিয়া বোঝে।

গিন্নি বলিলেন, ও ভালুক-অলা, এক গোছা লোম ছিঁড়ে দাও তো, জ্বর চমকের খুব ভাল ওষুধ।

ভালুক-অলা ঝুলির মধ্যে হাত চালাইয়া একগোছা লোম বাহির করিল।

না, ওতে হবে না, টাটকা লোম চাই, আমার সুমুখে ছিঁড়ে দাও।

স্নেহময় পিতা পুত্রের অঙ্গ হইতে পট্‌পট্‌ করিয়া একগোছা লোম টানিয়া তুলিল। সে অবশ্যই ভালুকটিকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসে কিন্তু টাকা বড় বালাই।

নীলমণি সব বোঝে কিন্তু এটি বুঝিতে পারে না, প্রত্যেকবার খেলা দেখাইবার পরে তাহার প্রভু একগোছা লোম টানিয়া ছেঁড়ে কেন। মানুষে ওগুলা লইয়া কি করে? ভাবে মানুষ বড় অদ্ভুত জীব।

হঠাৎ সে মাটিতে পড়িয়া গিয়া, জড়োসড়ো হইয়া ঘন ঘন ধুঁকিতে লাগিল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, জ্বর এসেছে, ওর জ্বর এসেছে।

নীলমণি ভাবে কি বিপদ, পরিশ্রমের পরে কি একটু বিশ্রাম করিতে দিবেনা। সকলে এমন চীৎকার করে কেন?

২

হাঁরে বিন্দি কি করছিস ?

বাসন মাজছি মা।

এতক্ষণে বাসন মাজা হচ্ছে, বেলা কত হ'ল ?

কই আর বেলা হ'ল, সূর্য্য এখনো বাঁধের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তবেই তো অনেক বেলা হ'য়েছে, এতক্ষণে তরকারি কোটা হয় যে।

তুমি শু'য়ে থাকো না মা, সর্ব সময় মতো হবে।

আর সময় মতো হবে, আজ খেতে খেতে আড়াইটের গাড়ী এসে যাবে।

যাক্ গে, তুমি রুগী মানুষ শুয়ে থাকো।

আমি রুগী বলেই তো তোদের এত বাড়াবাড়ি হ'য়েছে। ওদের কুটনো কুটতে বল্ না।

কারা ? দিদিমণিরা তো নেই।

নেই ? এত সকালে গেল কোথায় ?

এবারে বিন্দি হাসিয়া বলিল, সকাল আবার কোথায় ? এখনি যে বল্লে কত বেলা হয়েছে।

তবেই তো হ'ল, এত বেলায় তারা গেল কোথায় ?

পাশের বাড়ীতে গিয়েছে।

কেন !

সেখানে যে ভালুক নাচ হচ্ছে।

মরি মরি কি শখ। মা মরে কি বাঁচে তার ঠিক নেই, এই তাদের ভালুক নাচ দেখবার সময় হ'ল।

তাদের কি একটা শখ আহ্লাদ নেই, সব সময়ে কি বাড়ী আগলে থাকবে?

আমি মরলেই তোরা সব খুশী হ'স তা জানি।

ও কি কথা মা। আমি না হয় তাদের ডেকে আনছি।

না আর ডাকতে হবে না। কিন্তু পাশের বাড়ীতে হঠাৎ ভালুক নাচতে গেল কেন?

ভালুক কি আর এমনি নাচে, ক'দিন হ'ল ওখানে ভাড়াটে এসেছে। খুব বড় লোক মা।

হুঁঃ, বড়লোক। আমার বাপের বাড়ী তো দেখিস নি তোরা।

তার চেয়ে আমি দিদিমণিদের ডেকে আনি।

বিন্দি এই ভয়টিই করিতেছিল। একবার গিন্নির বাপের বাড়ীর কথা উঠিয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই, সেখানকার সব মহিমা আদ্যন্ত শুনিতেই হইবে, তা আড়াইটের গাড়ীই আসিয়া পড়ুক আর সাড়ে বারোটার গাড়ীই ছাড়িয়া যাক। প্রতিদিন সকাল বেলাতেই এইরূপ কথোপকথন হইয়া থাকে, আজকার দিনে ভালুক নাচের প্রসঙ্গটা নূতন। কিন্তু আজ বিন্দিকে ভবানীদেবীর বাপের বাড়ীর কথা শুনিতে হইল না, মেয়ে দুটি ফিরিয়া আসিল।

কায়া বলিল, মা অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম তোমার হাতে ভালুকের লোম বেঁধে দিলে জ্বরটা বন্ধ হবে। আজ ও বাড়ী ভালুক নাচ হচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি গেলাম। এই দেখ এনেছি।

এই বলিয়া সে একগোছা ভালুকের লোম বাহির করিয়া মায়ের বাহুতে বাঁধিয়া দিল।

ছায়া এতক্ষণে বুঝিল কায়া কেন স্বহস্তে ভালুকের লোম উৎপাটন করিয়া লইয়াছিল ; তখন বোঝে নাই, এখন বোনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

গিন্নি আপত্তি করিল না, কেবল বলিল, আর জ্বর বন্ধ হবে! এবারে প্রাণটা গেলেই সব জ্বালা জুড়োয়, আমিও বাঁচি, তোরাও বাঁচিস, আবার তোদের বাবাও বাঁচে।

বিন্দি অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, সে মনে মনে পাদপূরণ করিয়া বলিল, আমিও বাঁচি।

ভালুকলোমের কার্য্যকারিতায় কায়ার যথোচিত বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক সে জানিত মায়ের উদ্যত রাগের প্রশম হইবে। ছায়াকে কিছু বলে নাই, তাহার ধারণা ছায়া বোকা, তায় আবার একগুঁয়ে, হয়তো ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিবে।

ও বাড়ীতে কারা এসেছে রে ?

তা কেমন ক'রে বল্‌বো! কল্‌কাতার লোক, তবে মনে হ'ল খুব বড় লোক।

বড় লোক ? কি করে বুঝলি ? মামার বাড়ীর কথা কি তোদের মনে আছে ?

সর্ব্বনাশ !

কায়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের আশায় বলিল, মা, ও বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নি ছেলে তিনজনে যেন তিনটি খইয়ের মোয়া।

তার মানে ?

খইয়ের মোয়ার মতো মোটা আর ফাঁপা।

তোদের মামার বাড়ীতে এক ভোজপুরী দারোয়ান ছিল—

খুব মনে আছে মা, সে তো মুড়ির মোয়া, আঁটো সাটো। এরা খইয়ের মোয়া।

আর নবীন নামে এক গোমস্তা ছিল—

ওদের সঙ্গে আবার এক মাষ্টার এসেছে।

মাষ্টারও এসেছে, তবে বুঝি কিছুকাল থাকবে।

তাইতো শুনলাম, বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছে।

বোমার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া ভবানী শুধাইলেন, শুনলি! কার কাছে শুনলি?

আমরা যেতেই গিন্নি বল্‌লেন, এসো ব'সো মা, শুধোলেন তোমরা বুঝি পাশের বাড়ীতে থাকো—

আর কি হ'ল শুনি?

ছায়া সত্যই বোকা, সে বলিয়া ফেলিল, চা খেতে দিলেন।

কায়া সরোষে ছায়ার দিকে তাকাইল, কিন্তু মুখের কথা বলিয়া ফেলিলে নাকি আর ফেরে না।

আর কি গিল্‌লি শুনি?

সকালবেলাতে আর কি দেবে?

তুই চুপ কর্, ছায়া তুই বল্।

সত্যিই তো সকালবেলাতে আর কি দেবে?

বল্‌লি নে যে তোদের মা আজ পাঁচ বছর বিছানা নিয়েছে?

কি যে বলো মা, ও কথা কি বলা যায়?

তুই চুপ কর্, তুই বড় বাজে বকিস্, ছায়া তুই বল্।

আমি বল্‌লাম, মা এতক্ষণে কুটনো কুটছে।

বল্‌লি ঐ কথা! যদি কখনো বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসে?

বিন্দি সমস্যা সমাধানের আশায় বলিল, তা মা শুয়ে শুয়ে কি আর দুটো কুটনো কোটা যায় না ?

ভবানী মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, যাও এবার গেলো গে।

তারপরে নিজের মনে বকিয়া চলিলেন—না তার বুঝি আর দরকার নেই, বড়লোকের বাড়ী থেকে না জানি কত কি গিলে এসেছে! বড় লোক! হুঁঃ বড় লোক। বড় লোক হবে তো বোমার ভয়ে পালিয়ে আসবে কেন ?

ভবানী দেবী আজ চার পাঁচ বছর শয্যাশায়ী। জ্বরে ও নানাবিধ উপসর্গে ভুগিয়া একেবারে কাঠি হইয়া গিয়াছেন, এখন উত্থান-শক্তি রহিত। নরসিংপুর নিতান্ত স্বাস্থ্যকর স্থান তাই প্রাণটা এখনো আছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের ফলে তাঁহার মেজাজ বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, অল্পেই রাগিয়া ওঠেন, সংসারে যা কিছু স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক তাহার উপরে তাঁহার ক্রোধের অন্ত নাই। এ যেমন ব্যয়ের দিক, আয়ের দিকেও কিছু আছে। অনেক সময় শয্যাশায়ী রুগ্‌ণ ব্যক্তির অনুমান ও কল্পনাশক্তি প্রবল হইয়া ওঠে, ভবানীরও হইয়াছে। লোকে চোখে দেখিয়াও যাহা বুঝিতে পারে না, লোকমুখে শুনিয়া, নিছক অনুমানের দ্বারা তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। এ-ও একরকম ঘ্রাণশক্তি। ছায়া কায়া তাঁহার দুটি মেয়ে, অন্য পুত্রকন্যা নাই। কায়ার পূর্ণাঙ্গ নাম কয়াধূ। কায়ার মামা সত্যেন দত্তর কয়াধূ কবিতার গুণে মুগ্ধ হইয়া সেটি আবৃত্তি করিতেছিলেন এমন সময়ে কায়া ভূমিষ্ঠ হইল, তিনি নাম রাখিলেন কয়াধূ। কিন্তু বাঙালীর মুখে ও কানে কয়াধূ বেমানান তাই সেটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল কায়া। বড় বোন ছায়ার সঙ্গে মিলিয়া কায়া এখন বেশ কায়েম হইয়া বসিয়াছে, বিবাহের

বেনারসীর মতো কয়াধূ এখন কালে ভদ্রে মাত্র বাহির হয়। পিতা তারিণী বাবু ভাবেন মেয়ে দুটি দায়। মাতা ভবানী দেবী ভাবেন মেয়ে দুটি 'এসেট', বুঝিয়া শুনিয়া চালিতে পারিলে কী না সম্ভব।

৩

এমন সময়ে হন্তদন্ত হইয়া তারিণীবাবু প্রবেশ করিলেন। একটি সরল রেখার স্থানে স্থানে জ্যামিতি শাস্ত্রে বর্ণিত যাবতীয় কোণ গুলি সন্নিবিষ্ট হইলে তারিণী বাবুর চেহারার কতকটা ধারণা পাওয়া সম্ভব, সবটা পাওয়া যাইবে না, কারণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এমন সব কোণ সৃষ্টি করিয়াছে জ্যামিতিতে যাহার বর্ণনা নাই। তিনি দীর্ঘকাল নরসিংপুরে আছেন, এখানেই নিবাস বলিলে অন্যায় হয় না। তিনি সামান্য ঠিকেদারী কাজ করেন, বাড়ীটি নিজস্ব।

আজ কেমন আছ ?

আর কেমন আছি। এখন মরলেই বাঁচি, তোমরাও বাঁচো। তে রাত্তিরও পোয়াবে না।

শয্যাশ্রয় করিবার পরে ভবানীর মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তিনি মরিবামাত্র তাঁহার স্বামী পুনরায় বিবাহ করিবেন। একটু বিরক্ত হইলেই আগে বলিতেন, আমি মরলেই তো আবার বিয়ে করবে, তে রাত্তিরও পোয়াবে না। এখন কেবল শেষটুকু বলেন, তাহাতেই সকলে সব কথা বুঝিতে পারে।

প্রথম প্রথম তারিণী বাবু অস্বীকার করিতেন যে ঐরূপ ইচ্ছা

তাঁহার নাই, কিন্তু তাহাতে কলহ আরও বাড়িত। এখন আর অস্বীকার করেন না, চুপ করিয়া থাকেন, অন্য কথা পাড়েন।

কাল্‌কার ওষুধটায় যেন একটু ফল হয়েছে।

হ'য়েছে মাথা আর মুণ্ডু। দেখো আমি মরলে তে রাত্তিরও পোয়াবে না জানি, তাই মরবার আগে মেয়েদের বিয়েটা দেখে যেতে চাই।

সেই জন্যেই ছায়াকে তো কলেজে দিয়েছি।

কলেজে দিয়েছ তো মাথা কিনে নিয়েছ, কিন্তু আমি বলবো বাপু ছায়ার চেয়ে কায়া অনেক ভালো।

মাতার কথা মিথ্যা হয় না। ছায়া ছিপ্‌ছিপে, ফর্সা, মুখে চোখে ধারালো ছুরির উজ্জ্বলতা। কায়া কালো, মোটা সোটা, গাব্‌দা গোব্‌দা, নাকটা মোটা, চোখ দুটা গোল, অপটু কুমোরের হাতের একমেটে পুতুল। ছায়া স্বল্পভাষী, কায়া মুখরা, ছায়া বুদ্ধিমতী, কায়া চতুর।

তারিণী বাবু বলিলেন, হাঁ, ঘর গেরস্তালীর কাজে কায়া পটু বটে।

তবে! বলিয়া ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন, যেন এ বিষয়ে চরম কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু কি জানো আজকার ছেলেরা একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে চায়।

লেখাপড়া শিখলেই অমনি বর এসে জুটবে?

না শিখলে নিশ্চয়ই আসবে না।

দেখো নিশ্চয় আসবে। আমি বলে রাখছি ঐ কায়ার বিয়েই বড় ঘরে হবে।

সে তো খুব সুখের কথা।

সুখের কথা মুখে বল্‌লেই হয়না। সারাদিন চাষা মজুরেব পিছনে পিছনে ঘুরবে ঘর বর চিনবে ।ক রকমে ?

একটা বড় ই঺দারা খুঁড়বার ঠিকে নিয়েছি তাই –

এখন একবার যাওনা পাশের বাড়ীতে যে ভাড়াটে এসেছে তাদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করে এসো। কল্‌কাতার লোকগো।

তাই নাকি ?

তাই নাকি ! আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে যেটুকু খবর রাখি তুমি মাঠে ঘাটে ঘুরেও তা জানোনা। দেহাতী লোক আর কাকে বলে।

বেশ তো বিকালের দিকে একবার যাবো। এই তো পাশের বাড়ী, মাঝে এক খানা মাঠ বই নয়, প্রতিবেশী বল্‌লেই হয়, খোঁজ খবর নিতে হয় বই কি।

শুধু গেলেই হয় না, ভালো ক'রে সব জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ক'দিন থাকবে, কেমন অবস্থা, নাম ধাম।

তা সব জিজ্ঞাসা করতে হবে বই কি, প্রতিবেশীর খবর না জানলে চলবে কেন।

তাই বলে আবার গোঁয়ারের মতো কথা বলোনা, তোমার আবার চাষা মজুরের সঙ্গে ওঠাবসা কিনা।

না না, সে ভয় করোনা। বিকালে নিশ্চয় যাবো। আজ হাটবার, হপ্তা দিতে হবে, একটু তাড়া আছে।

এই বলিয়া তারিণী বাবু প্রস্থান করিলেন এবং খুব সম্ভব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংসার কি মধুময় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাবেলা তারিণী বাবু বাড়ীতে আসিবামাত্র পত্নীর ঘরে তাঁহার তলব হইল। তিনি আসিলে ভবানী কন্যাদের আদেশ করিলেন, তোমরা ওঘরে গিয়ে গল্প করো তো।

তারপরে স্বামীর দিকে তাকাইয়া শুধাইলেন, কি দেখা করতে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম বই কি। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। খুব মহাশয় ব্যক্তি।

হঠাৎ এখানে আসতে গেল কেন?

সবাই যে জন্য আসছে, বোমার ভয়ে।

ভদ্রলোকের নাম কি?

সারদা চৌধুরী, কল্‌কাতায় বৌবাজারে পৈতৃক বাড়ী। বড়লোক বলেই মনে হ'ল?

কিসে মনে হ'ল শুনি?

একটা মানুষ দেখে কি বুঝতে পারা যায় না?

বুঝ্‌তে পারা গেলে আর তোমার হাতে বাবা আমাকে দেন!

কই আমার তো মনে পড়ে না যে আমরা ধনী এমন কথা বলে ছিলাম।

কথায় বলনি ভাবে ভঙ্গীতে বলেছ।

তারিণী বাবু অনেকদিন স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন, তবু হঠাৎ এক একবার উল্টা কথা বলিয়া বসেন। হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো।

ছেলে মেয়েতে ক'টি?

একটি মাত্র সন্তান, পুত্র।

বয়স?

তারিণী বাবু ভাবিলেন, একি উকীলের জেরা নাকি? বলিলেন, বছর দশেক হবে।

রোগিনীর রক্তহীন মুখে আশাভঙ্গের লক্ষণ কেহ লক্ষ্য করিল না।

এখন তা হ'লে উঠি, সারা দিনের হিসাব-পত্র লেখা বাকি আছে।

আর ওদের মাষ্টারের খবর নিয়েছিলে?

মাষ্টার! মাষ্টার আবার আছে নাকি?

তবে তোমাকে কি জন্য পাঠিয়েছিলাম ভাবো?

তারিণী বাবু কাঠির মতো নীরস। কাঠিখানা হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে হাতে বেঁধে, তাঁহার সে শক্তিটুকুও নাই। তিনি নিজের ভাগ্য স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস চাপিলেন।

কিন্তু হঠাৎ মাষ্টারের খবর কেন?

আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মাষ্টারের খবর কেন! কে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে বসে আছে কে বল্‌তে পারে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

প্রাণপণ চেষ্টায় মাথা একটুখানি তুলিয়া আবেগের সঙ্গে ভবানীদেবী বলিলেন, তা জানি গো জানি, আমি মরলে ওরা পথে বসবে। তেরাত্তিরও পোয়াবেনা, তেরাত্তিরও পোয়াবেনা।

তারপরে শুইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

তারিণী বাবু ভাবিলেন, কি আপদ্‌। মাষ্টার, মেয়ের বিবাহ, হাঁড়িতে চাল দেওয়া সমস্তই তাঁহার কাছে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নীরবে নিজের ঘরে সরিয়া আসিয়া হিসাব রচনার শুষ্ক ডাঙায় পদার্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

৪

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ কলিকাতার ওলট পালট হইয়া গেল। দইয়ের হাঁড়িতে মন্থনদণ্ড চালাইয়া সবেগে মন্থন করিয়া দিলে যেমন সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়া জমাট দই ফেনায়, কল্লোলে মুখরিত হইয়া একাকার হইয়া যায় কলিকাতার তেমনি অবস্থা হইল। পালাও, পালাও রব উঠিল, জাপানী আসিতেছে, বোমা পড়িয়া কলিকাতা আর আস্ত থাকিবে না। দিনে রাতে অষ্টপ্রহর লোক সহর ছাড়িয়া পালাইতে স্নুরু করিল। বাহিরে কোথায় যাইবে, সেখানে গিয়া কোথায় থাকিবে, কি খাইবে সে চিন্তা কেহ করিল না। ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী, রিক্সা, ঠেলা গাড়ী বোঝাই হইয়া অসহায় নরনারী হাওড়া ও শেয়ালদ অভিমুখে চলিল। গাড়ীতে স্থান না পাইয়া অনেকে স্টেশনেই পড়িয়া রহিল। জাপানী আসিতেছে, কোথাও কিছু আর আস্ত থাকিবে না। যাহারা নিতান্ত কলিকাতা ছাড়িতে পারিল না, তাহারা সহরের মধ্যেই পাড়া বদল করিল, টালার লোকে টালিগঞ্জে আসিল, বালিগঞ্জের লোকে বাগবাজারে পৌঁছিল। সকলেরই ধারণা তাহার বাড়ীটাই জাপানী বোমার লক্ষ্য। যাহার বাড়ীর কাছে একটা তেলের কলের চিমনী, তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস হইল ঐ কলটা ধ্বংস করিবার জন্যই জাপানের যুদ্ধোদ্যম, অতএব পালাও, পালাও, যেখানে হোক, যেমন ভাবে হোক, সহরে আর এক মুহূর্ত্ত নয়। বিহার ও উড়িষ্যার সাধারণ লোকে যাহারা কলিকাতায়

গৃহস্থের ঘরে পাচক, চাকর ও দারোয়ানের কাজ করিত তাহারা রেল গাড়ীর উপরে ভরসা না করিয়া পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া হাঁটিয়া দেশে রওনা হইল। যে সব বাঙালী এতকাল নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত যে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙালীর অন্ন লুটিয়া খাইতেছে, তাহারা একদিনে অসহায় হইয়া পড়িল, দেখিল পাচক নাই, চাকর নাই, দারোয়ান নাই, তখন কপাল চাপড়াইয়া অভিসম্পাত দিল, বলিল, সব নেমকহারাম। সপ্তাহকাল মধ্যে কলিকাতা জনবিরল হইয়া গেল, দিনে লোক চলাচল কম, রাত্রে পথ নির্জন, অনেকদিন পরে কলিকাতার পথে রাত্রে শিবাধ্বনি উঠিল, আর সেই সঙ্গে প্রলয়ের শিঙাধ্বনির মতো মাঝে মাঝে সাইরেনের হৃৎকম্পকারী আর্ত্তনাদ। পালাও, পালাও, কলিকাতায় আর নিরাপত্তা নাই। সমস্ত সহর রাতের আলো নিভাইয়া দিয়া অভাবিত ভীতির সুড়ঙ্গটার মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দিয়া ইষ্টনাম জপিতে লাগিল।

বৌবাজারের এক গলিতে সারদা চৌধুরী স্ত্রীপুত্র লইয়া, কোম্পানীর কাগজে ভর করিয়া সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন, এখন সচকিত হইয়া বুঝিলেন কোম্পানীর কাগজ কাগজের নৌকামাত্র, তাহাও ঠিক আবার বানচাল হইবার মুখে। তিনি কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিলেন, গিন্নি কোথায় যাবো ?

গিন্নি বলিলেন—চলো রানাঘাটে যাই।

রানাঘাটে তাঁহার পিত্রালয়।

সারদাবাবু অসহায় ভাবে বলিলেন, গিন্নি ওরা যে ঐ দিক দিয়েই আসবে।

সারদাবাবুর ধারণা জাপানীরা রীতিমতো টিকিট কিনিয়া

ইষ্টবেঙ্গল রেলপথে শেয়ালদ ষ্টেশনে আসিয়া নামিবে, সেই পথেই যে রানাঘাট। তাঁহার ধারণা রানাঘাটের লোকে আগে মরিবে।

তবে!

ভগবান আছেন।

ভগবানের সৌভাগ্য যে এতদিন পরে তিনি সারদাবাবুর মনে পড়িলেন।

নরসিংপুর সিংভূম জেলায় সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ছোট একটি সহর। সেখানকার সন্ধান তিনি পাইলেন পাড়ার স্কুলের মাষ্টার সঞ্জীব রায়ের কাছে। সঞ্জীব রায় পাড়ার এক স্কুলে সামান্য মাষ্টারী করিতেন, স্কুল বন্ধ হইয়া গেল, তিনি সানন্দে কলিকাতায় থাকিয়া গেলেন। সারদাবাবুর সঙ্গে তাঁহার মুখচেনা পরিচয় ছিল। তাঁহার কাছেই সারদাবাবু নরসিংপুরের সন্ধান পাইলেন।

সঞ্জীব বলিলেন, সেখানে যান না কেন?

সারদাবাবু বলিলেন, যদি ওরা আসে—

না জাপানীরা ওখানে যাবে না।

তখন সারদাবাবু, বহুকালের বনেদী ধনী, ধনমানের গৌরব ভুলিয়া সেই সামান্য স্কুল মাষ্টারের দুটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—আমাদের সেখানে পৌঁছে দিন সঞ্জীববাবু, আপনি আমার ছোট ভাই।

সঞ্জীববাবু ইতিপূর্ব্বে কখনো নরসিংপুরে যান নাই; তবে সমস্ত খবর রাখিতেন, তিনি সপরিবারে সারদাবাবুকে নরসিংপুরে পৌঁছাইয়া দিলেন।

সেখানে পৌঁছাইয়া গিন্নি বলিলেন—ওঁকে ছেড়ো না, উনি ওদের সব খবর রাখেন।

সারদাবাবু বলিলেন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে সঞ্জীববাবু, আপনি তো সংসার করেন নি, আপনার আবার ভাবনা কি! আমি যে ছাঁপোষা মানুষ।

কাজেই সন্তুর মাষ্টাররূপে তিনি থাকিয়া গেলেন, পাহাড়, জঙ্গল, মাঠ তাঁহার বড় প্রিয়।

একদিন সারদাবাবু সঞ্জীবকে বলিলেন, মাষ্টারমশাই এ কোথায় আনলেন, কেবল গুচ্ছের পাথর।

কেন চারদিকে এমন Scenic Beauty!

সারদাবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ তাতো আছেই।

ভাবটা এই যে সম্ভব হইলে ঐ পাহাড়গুলা তিনি অপসারিত করিতেন। কিন্তু তা যখন নিতান্তই সম্ভব নয়………। এক একদিন অনেকরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া সারদাবাবু ভাবিতেন এখানে বেঘোরে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে কলিকাতায় বোমার আঘাতে বাড়ী চাপা হইয়া মরাও অনেক ভালো; ভাবিতেন হায় এ কোন্ তেপান্তরে আসিয়া পড়িলাম!

কলিকাতাত্যাগীদের অনেকেরই সারদাবাবুর মতো অবস্থা। এতদিনে তাহারা প্রথম দেখিল যে কলিকাতার বাহিরেও মস্ত একটা পৃথিবী আছে, হয় তো বা কলিকাতার চেয়েও আয়তনে বড়, আগে শুনিয়াছিল মাত্র। তাহারা যাহা দেখে তাহাতেই বিস্ময় বোধ করে, যাহা কেনে তাহাই Damn Cheap মনে হয়। তাহারা ভাবে আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, পৃথিবীতে এতও ছিল।

সারদাবাবু বাসায় আসিয়া পোঁছিবার কিছু পরেই দশ বারো বছরের একটি মেয়ে আসিয়া হাজির হইল।

গিন্নি বলিলেন, তোর নাম কি?

আমার নাম পাঁপড়ি।

এই বলিয়া ফুলের পাঁপড়ির মতো শুভ্র দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিল।

কি করিস?

কাজ করি।

কোন্ বাড়ীতে?

এই বাড়ীতে।

সে আবার কি?

ঐতো মা, আমি গেরস্তর ঝি নই, বাড়ীর ঝি, এই বাড়ীর ঝি আমি।

তোর বাপ মা কোথায়?

সব ম'রে গেছে।

থাকিস কোথায়?

এই বাড়ীতে।

যখন ভাড়াটে না থাকে।

তখন তো আরো মজা, সারা বাড়ী জুড়ে থাকি।

খা'স কোথায়?

লোকের বাড়ী চেয়ে চিন্তে।

তা'হলে তুই থেকে যা।

সেইজন্যেই তো এসেছি।

এই বলিয়া সে ঝাঁটাখানি তুলিয়া লইয়া সবেগে উঠান ঝাঁট দিতে সুরু করিল।

গিন্নি ভাবিলেন, বেতনের কথাটা বাজাইয়া লওয়া ভালো।

কত চা'স?

যা দেবে।

গিন্নি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না, কেবল ভাবিলেন কলিকাতায় এমনটি হইবার উপায় নাই, বুঝিলেন এখানকার দেহাতী লোক নির্ব্বোধ! হইবেই বা না কেন? পাথুরে দেশের লোকের পাথুরে বুদ্ধি। যাই হোক, অতি সুলভে (কিছু না দিলেও কি চলিবে?) ভৃত্য সমস্যার সমাধান হইল দেখিয়া কালো মেঘে সোনার রেখা যখন তিনি কল্পনা করিতেছেন শুনিতে পাইলেন, মাছ চাই মা?

এক বুড়া মাছ আনিয়াছে।

কি মাছ গো?

রুই আছে, কাৎলা আছে, পুঁটি আছে।

দাম?

সব এক টাকা।

বিস্মিত গৃহিণী বলিলেন, রুই কাৎলাও এক টাকা আবার পুঁটি মাছও এক টাকা।

হাঁ মা এখানে তাই বিক্রি হয়।

কি দেশ মাগো! ওগো শুনেছ—বলিয়া তিনি 'ওগোর' উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

পাঁপড়ি তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পাঁপড়ি অকারণে হাসিয়া ওঠে এই তাহার বড় দোষ।

৫

সারদাবাবু নেহাৎ মিথ্যা বলেন নাই, এখানে কেবলই গুচ্ছের পাথর। আর বড় কিছু নাই, পাহাড় আর শালবন।

নরসিংপুরের চারদিকে পাহাড়, ছোট বড়, উঁচু নীচু, দূর নিকট। পাহাড়ের সারির পরে পাহাড়, বর্ষার পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেলে দেখা যায় পর পর পাহাড়ের সারির আর অন্ত নাই, ভাঁজে ভাঁজে পাহাড়, অস্পষ্ট আকাশে সব এক বলিয়া মনে হয়। মাঠের উঁচু জায়গায় দাঁড়াইলে দেখা যায় যে দিগন্তের আগাগোড়া পাহাড়ে বেষ্টিত। সাঁওতাল পরগণার মতো ন্যাড়া পাহাড় নয়, ঘন প্রাচীন শাল বনে আবৃত। শাল বন পাহাড় ছাড়িয়া সহরের প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। এক সময় সহরের জমিও শাল বনে আচ্ছন্ন ছিল, বন কাটিয়া জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে, এখনো ইতস্ততঃ শাল গাছের গুচ্ছ। মানুষের স্পর্শে বন বাগান হইয়া উঠিয়াছে।

চারদিকের মাঠ খাদে নিখাদে তরঙ্গিত, নিখাদের উপরে স্থানে স্থানে দশ বারো খানা বাড়ী, ছোট ছোট লোকালয়, খাঁদের মধ্যে ধানের ক্ষেত, বাঁধের জল, আর কোথাও বা রুক্ষ লাল গৈরিক মাটি।

সহরের উত্তর দিকে ছোট একটি টিলা আছে, পলাশডুংরি, ডুংরি মানে পাহাড়। তার নীচে একটা বাঁধ, পাশে এক খণ্ড পাথর। সেদিন বিকাল বেলায় সঞ্জীব সেখানে বসিয়াছিল, আসন্ন

সন্ধ্যার শান্ত মহিমায় তার মন অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল, চোখ তার পিছনে পিছনে ডুব দিয়াছিল।

সঞ্জীবের হঠাৎ সারদাবাবুর কথা মনে পড়িল, সঞ্জীববাবু এ কোথায় আনলেন, কেবল গুচ্চের পাথর। সঞ্জীব মনে মনে হাসিল, ভাবিল, কাহারো কাছে পাহাড় কেবল অনাবশ্যক নীরস পাথরের স্তূপ, আবার কাহারো কাছে পরম রহস্যের আকর, প্রহ্লাদ তো ঐ পাথরেই নারায়ণের অস্তিত্ব সন্দেহ করিয়াছিল। সঞ্জীব ভাবিল যে-পাথর নীরস, সেই পাথরই তো রসের ঝরণা ঝরায়।

তাহার পাঁপড়ির কথা মনে পড়িল। পাঁপড়ি বলিয়াছিল, দাদাবাবু তুমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে এমন ক'রে ব'সে থাকো কেন, কি দেখো ?

প্রহ্লাদের গল্প শোননি পাঁপড়ি, পাথরের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন !

পাঁপড়ি কি বুঝিল জানি না, বলিল—নারায়ণ না থাকুন বাঘ ভালুক আছে, এখন ধান কাটা হচ্ছে, মাঝে মাঝে হাতীও নেমে আসে ঐ পাহাড় থেকে।

বলো কি !

সত্যি বলছি। মা'র কাছে শুনেছিলাম ধান কাটতে গিয়ে বাবা হাতীর মুখে পড়েছিলেন।

আচ্ছা পাঁপড়ি ঐ পাহাড়ে যাওয়া যায় ?

খু—ব।

কিন্তু বাঘ ভালুক—

দিনের বেলায় তারা কি করবে

তুমি গিয়েছ ?

কত বা-র। ঐ যে পাহাড়টা দেখ্‌ছ দাদাবাবু, ঐ পাহাড়টায় একটা ঝরণা আছে, ওটাকে বলে ধারাগিরি।

কিন্তু যাবো কেমন ক'রে, অনেক দূর যে !

এইবার সে হাসিয়া ওঠে, বলে, হেঁটে যাবে কেন ? অনিল বাবুর লরি যায় কাঠ নামিয়ে আনতে, চড়ে চলে যাও।

তারপরে একটু থামিয়া বলে, কিন্তু আসবার সময়ে দাদাবাবু কাঠের গাদার উপরে চড়ে আসতে হবে, একটু ফস্‌কালেই একেবারে নীচে দড়াম ক'রে—

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে, সিসুগাছের কচি পাতাগুলা যেন রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করে।

তাহলে দেখি একবার অনিলবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে।

অনিলবাবুর বাড়ী চেনো তো—ডাকঘরের কাছে।

এমন সময়ে গিন্নির ডাক শুনিয়া সে প্রস্থান করে।

সঞ্জীবের বেশ লাগে ঐ মেয়েটিকে। তাহার ভালো লাগাকে মেয়েটি এক রকম করিয়া বুঝিতে পারে। সারদাবাবুদের কাছে এসব প্রসঙ্গ তুলিবার উপায় নাই।

এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল অদূরে নীলমণির বাপ ও নীলমণি, তাহার তন্ময়তার অগোচরে কখন্ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

কি নীলমণির বাপ, কোথায় গিয়েছিলে ?

সে একটি সেলাম করিয়া বলে, হুজুর গন্ধানীর হাটে।

কেন ?

এদিকের মধ্যে বড় হাট, অনেক লোক আসে, কিছু পয়সা পাওয়া যায়।

আচ্ছা নীলমণি—

সে হাসিয়া বলে, হুজুর আমার নাম মুরলী।

তবে যে লোকে নীলমণির বাপ বলে।

ভালুকটার নাম নীলমণি দিয়েছি, তাই লোকে আমাকে নীলমণির বাপ বলে।

আচ্ছা মুরলী, ভালুকটাকে টেনে নিয়ে বেড়াও ওর কষ্ট হয় না।

হয় বই কি হুজুর, কিন্তু ব্যবসার খাতিরে করতে হয়।

সঞ্জীব একবার ভালো করিয়া নীলমণির দিকে তাকায়, ঘন লোমে ঢাকা, নাকে দড়ি বাঁধা জন্তুটা কেমন অসহায় ভাবে চাহিয়া আছে, তাহার মনে হয় কোনো শাপভ্রষ্ট দেবশিশু, বুঝিতেছে সবই কিন্তু বলিবার ক্ষমতা নাই; নতুবা চোখ দুটা চাপা কথার আভায় এমন উজ্জ্বল কেন।

মুরলী তোমার বাড়ী কোন্ গাঁয়ে?

কাছিম দ।

সে কত দূর?

সহরের পূবদিকে যেখানে নদীটা বেঁকেছে সেই মোড়ের উপরে।

একদিন যাবো।

যাবেন বই কি হুজুর।

তোমার বাড়ীতে আর কে কে আছে?

মুন্সী আর সুরকি

ছেলে বুঝি?

না হুজুর বেড়াল আর কুকুর—সে হাসে।

বিয়ে করনি কেন?

ভালুক-অলার বিয়ে না করাই ভালো, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই, বউ আগলাবে কে?

বুড়ো হ'য়ে পড়লে তোমাকে আগলাবে কে? মুন্সী আর সুরকি?

মুরলী হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

সঞ্জীবের পাঁপড়ির হাসির কথা মনে পড়িল, তাহার মনে হইল খুব সম্ভব এদেশের হাওয়ায় হাসির খোরাক আছে।

আজ কত রোজগার হ'ল?

তা হুজুর টাকা পাঁচেক হ'য়েছে।

রোজ এমন হয়?

তা কি হয় হুজুর! গন্ধানীর হাট বলেই হ'ল। তাছাড়া গরমকালে বর্ষাকালে একরকম বসেই থাকতে হয়, কিছুই হয় না।

কিছু জমি করো না কেন?

দেখবে কে?

বিয়ে করো, বউ দেখবে।

তাহলে ভালুক নাচ ছাড়তে হবে।

ছাড়লেই বা।

তা হয় না হুজুর, আমি কেবল পেটের দায়ে ব্যবসা করি না, জন্তু জানোয়ার আমি ভালোবাসি। একটা কথা বলি হুজুর, মানুষের চেয়ে ওদের ভালোবাসা সহজ, ওদের ভালোবাসা পাওয়াও সহজ।

এই বলিয়া সে ভালুকটাকে একবার জড়াইয়া ধরিল, ঘন লোমের মধ্যে বারকতক আঙুল চালাইয়া দিয়া আদর করিল, আর অদূরে একটা উইয়ের ঢিবি চোখে পড়িতেই তার খানিকটা

ভাঙিয়া আনিয়া নীলমণির সম্মুখে স্থাপন করিল। ভালুকটা অমনি পরম আগ্রহে সেটি মুখের কাছে তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল, তারপরে মাটিতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া ডিম-গুলিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে সুরু করিল।

একদিন দেখবেন গিয়ে হুজুর, মুন্সী, সুরকি আর নীলমণিতে তিনজনে মিলে কি রকম করে। নইলে আমার মতো লোকের বাড়ীতে আর আপনাকে আসতে বলবো কেন!

চল্ বাবা চল্।

এই বলিয়া সে দড়িতে টান দিল, হুজুর আজ আসি সন্ধ্যা হল, অনেকদূর যেতে হবে। আপনিও আর এখানে বেশিক্ষণ ব'সে থাকবেন না।

কেন?

শীতকাল কি না, হুঁড়ার বেরোতে পারে।

আচ্ছা তুমি যাও, আমি উঠ্‌লাম বলে।

সঞ্জীব দেখে মুরলীর পিছনে পিছনে ভালুকটা চলিয়াছে, সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া, দু'পাশে মৃদুমৃদু দুলিতে দুলিতে, চিন্তার ভারে যেন পা উঠিতেছে না।

ঐ মানুষটা আর জন্তুটা, দু'জনেই যেন ছদ্মবেশী, নতুবা ওদের মধ্যে এমন বিচিত্র সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব? মুরলীর কথা তাহার মনে পড়িল, মানুষের চেয়ে ওদের ভালোবাসাও সহজ, ওদের ভালোবাসা পাওয়াও সহজ।

সঞ্জীব উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, ঐ পাহাড়গুলাও যেন ছদ্মবেশী, ঘন শালবনের আবরণে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে; সব জানে, সব

বোঝে, কেবল প্রকাশের ক্ষমতা নাই। মুরলীর কথা হঠাৎ নূতন অর্থে তাহার মনে উদ্ভাসিত হইল। হয় তো বা মানুষের চেয়ে ওদেরও ভালোবাসা সহজ, ওদেরও ভালোবাসা পাওয়া সহজ।

নির্জ্জন রাত্রির ঘনীভূত নিস্তব্ধতারাশি তুই হাতে ঠেলিয়া পথ কাটিয়া কাটিয়া তারার আলোয় সঞ্জীব বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৬

মুন্সী, সুরকি আর নীলমণি মিলিয়া কি কাণ্ডই না আরম্ভ করিয়াছে। মৎস্যলোভী পাখীর দল বারে বারে নদীর দিকে উড়িয়া যাইতেছে, উঠানে ঘন ঘন ছায়া পড়িতেছে, মুন্সী আর সুরকি সেই ছায়ার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, মাটিতে আঁচড় কামড় পড়ে, কিন্তু পাখী ধরা পড়ে কই? ছায়া অপসৃত হইবা-মাত্র তাহারা উপরের দিকে তাকায়, ভাবে, পালাইল কি উপায়? অমনি আবার ছায়া পড়ে, আবার তাহারা অধিকতর বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়ে, মাটিতে আবার আঁচড় কামড় পড়ে কিন্তু পাখা তেমনি অনায়ত্ত রহিয়া যায়। তখন মুন্সী ভাবে সুরকির দোষ, সুরকি ভাবে মুন্সীর গাফিলতি, তাহারা পরস্পরের উপরে লাফাইয়া পড়ে। মুন্সী বেগতিক দেখিয়া নীলমণির কোলের কাছে আশ্রয় লয়, সুরকি আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। ছুটির পর্ব্বে হেডমাষ্টার যেমন গম্ভীরভাবে অদূরে বসিয়া ছেলেদের খেলা দেখেন, তেমনিভাবে নীলমণি রোদে বসিয়া আছে, হেডমাষ্টারেরও উপরে যিনি স্কুল কমিটির সভাপতি সেই মুরলী এখন অনুপস্থিত।

মুন্সী আর সুরকি বেশি বাড়াবাড়ি করিলে, বারান্দার হাঁড়িকুঁড়ির দিকে লক্ষ্য করিলে নীলমণি একবার ঘোঁতঘোঁত করিয়া ওঠে, তাহারা সংযত হয়। এবারে পাখীর ছায়া ছাড়িয়া মুন্সী ও সুরকি মল্লযুদ্ধ সুরু করিল। মল্লযুদ্ধে বেড়াল ও কুকুর দু'জনেই পটু, কুকুরের ক্ষিপ্রতা বেশি, বেড়ালের লঘুতা বেশি। কোণঠাসা হইলে মুন্সী লাফাইয়া খাপড়ার চালের উপরে ওঠে, সুরকি নীচে দাঁড়াইয়া সম্মুখের পা দু'খানা দেয়ালে স্থাপন করিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ওঠে, ভাবটা এরকম অন্যায় সুবিধা লওয়া উচিত নয়। মুন্সী প্লুতস্বরে বলে, মে-আউ অর্থাৎ তুমিও উপরে এসো না। এই বলিয়া চাল হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুরকিকে লুব্ধ করে, বেচারা একটা নিষ্ফল লাফ দিয়া মাটিতে পড়ে, বার দুই ডাকে, বলে, আচ্ছা এখন থাক্, বারান্তরে দেখিয়া লইব। এমন সময়ে পাড়ার একটা কুকুর দেখা দেয়, অমনি তাহারা ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সুরকি আগে মুন্সী পিছনে। উভয়ে তাড়া করিয়া কুকুরটাকে অনেক দূর লইয়া যায়।

নীলমণি জ্বরাক্রান্ত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া ধুঁকিতে থাকে। ধুঁকিতে থাকে আর কত কি কথা অস্পষ্ট-ভাবে তাহার মনে পড়ে। কুয়াশার মধ্যে গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত যেমন কিম্ভূত অপার্থিব মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়, তেমনি করিয়া তাহার জীবন-কথা নীলমণির মনে পড়ে। কোথায় যেন একটা বন ছিল, শাল মহুয়া হর্ত্তুকি অর্জ্জুনের বন। সে তখন কতটুকু? সুরকির চেয়ে ছোট, মুন্সীর চেয়েও ছোট কি? না মুন্সীর চেয়ে বড়। হঠাৎ কি একটা জানোয়ারের সম্মুখে পড়িয়া গেল, তখন বুঝিতে পারে নাই কি জানোয়ার,

এখন বুঝিতে পারে—শিয়াল। সেটা যে কখন্ পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইয়াছিল জানিতে পারে নাই, হঠাৎ সেটাকে দেখিয়া তাহার বিষম ভয় হইল, মনে হইল পলায়ন করাই উচিত, কিন্তু পালাইবে কি উপায়ে? নীলমণি চার পায় যেটুকু যায় এক পায়ে শিয়াল সেটুকু অতিক্রম করে। তখন নিরুপায় হইয়া সে আর্ত্তস্বরে ডাকিল, মা! কিন্তু মা কোথায়? সকাল হইতে তাহার দেখা নাই। নীলমণি বুঝিল আজ তাহাকে শিয়ালটার পেটেই যাইতে হইবে। এমন সময়ে হঠাৎ ওকি! শিয়ালটা দশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল কেন? সেটা খাড়া হইতে না হইতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল কে? নীলমণির মা। তাই বলো, মা কি তাহাকে বিপদের মুঁখে ফেলিয়া দূরে থাকিতে পারে। (মুহূর্ত্তমধ্যে লোভী জানোয়ারটা শতখণ্ড হইয়া গেল।) নীলমণি হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, বাপু হে শিয়াল মায়ের সঙ্গে চালাকি। মায়ের বীর্য্যে সে ভারি গৌরব অনুভব করে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলের কাছে আশ্রয় লয়; মা তাহাকে জড়াইয়া ধরে। তার পরে কি হইল সব কথা তাহার মনে পড়ে না, স্বপ্নের ছবির মতো সব কেমন একাকার হইয়া গিয়া ঝাপসা হইয়া যায়। ওটা কি শাদা মতো? আবার কোন জন্তু আসিল নাকি? না ওটা সেই টিলার মাথায় শাদা পাথরের স্তূপটা আর হল্‌দে রঙের ওটা কি? গোল্‌গোলি ফুলের ঝাড় নাকি? আগাইয়া আসিতেছে কেন? কি সর্ব্বনাশ! ওটা যে তাহার প্রভুর মাথার পাগড়ী। বুঝিল এটা কল্পনা নয়, দৃশ্য, নিজের অগোচরে কখন সে চোখ মেলিয়াছে। হল্‌দে পাগড়ী মাথায়, মুরলী উঠানে প্রবেশ করে। নীলমণি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসে, ভাবটা আমি জাগিয়া

পাহারা দিয়া বসিয়াছিলাম, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম নিন্দুকের কথা। কোথা হইতে মুন্সী আসিয়া প্রভুর পা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া প্যায়ে গা ঘষিতে থাকে, সুরকি বসিয়া লেজ নাড়িতে সুরু করে। উভয়ের ভাবটা সব ঠিক আছে কিনা দেখিয়া নিন। নীলমণির ভাবটা আমি ওদের উচিত শাসনে রাখিয়াছিলাম, দুরন্তপনা করিবে সাধ্য কি। আর চোর ডাকাত? আমি থাকিতে সে কথা ভাবিতেও পারি না।

এমন সময়ে সঞ্জীব উঠানে প্রবেশ করে, বলে মুরলী আজ তোমার একি পোষাক, এতো খেলা দেখাবার সাজ নয়।

মুরলী বলে, সেলাম হুজুর।

তারপর একখানা চারপায়া অগ্রসর করিয়া দিয়া বলে—হুজুর ঠিক ধরেছেন, খেলা দেখাতে এত ভোরে আর কোথায় যাবো?

তবে কোথায় গিয়েছিলে?

ঐ যে পাহাড়ের কোলে গাঁ-টা দেখছেন হলুদকাঠি, ওখানে।

কেন, নিজের লোক আছে বুঝি?

সে হাসিয়া বলে—কে কখন্ নিজের হয় কে বলতে পারে হুজুর!

খুলেই বলো না।

হুজুরের সেদিনের কথাটা মনে লাগলো।

কোন্ কথা?

ঐ যে বলেছিলাম বুড়ো বয়সে তোমাকে দেখবে কে?

সঞ্জীব সে প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল, বলিল, তা ওখানে কে আছে?

এবারে সে নবীন প্রেমিকের সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—হুজুর বিয়ে করবো ভাবছি।

তাহার লজ্জা দেখিয়া ও প্রস্তাব শুনিয়া সঞ্জীব হাসিল, বলিল, তা বেশ, বেশ। আমাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না।

মুরলী হাসিল।

এই তোমার মুন্সী আর সুরকি বুঝি ?

হাঁ হুজুর।

হঠাৎ মুন্সী নাম হ'তে গেল কেন ?

ওর মুরুব্বিআনা দেখলে আপনিও ওকে মুন্সী বলবেন।

আর সুরকি ?

আজ্ঞে ওর গায়ের রংটা সুরকির মতো লাল্‌চে।

বেশ, বেশ, মুন্সী এদিকে এসো তো।

মুন্সী এতক্ষণ অসহযোগ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু যেম্‌নি বুঝিল আগন্তুক প্রভুর আপন লোক, অমনি আহ্বানে সাড়া দিয়া তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া সঞ্জীবের কোলের উপর উঠিল এবং জড়োসড়ো হইয়া গম্ভীর ভাবে বসিল।

সঞ্জীব তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, সত্যি দেখছি খুব মুরুব্বি, দেখেছো কেমন বুড়ো গোমস্তাটির মতো বসেছে।

মুরলী বলিল—সুরকি যাও বাবুকে সেলাম করো।

সুরকি একটু আগাইয়া আসিয়া বার কতক লেজ নাড়িল, তারপরে বসিয়া পড়িয়া উন্মুখ হইয়া রহিল, ভাবটা এবারে কি হুকুম।

হুজুর, আমি নীলমণিকে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি, এরা আমার ঘর বাড়ী পাহারা দেয়, সাধ্য কি চোর ছ্যাঁচড় আসে।

নীলমণিকে দেখাইয়া সঞ্জীব শুধাইল, ওকে পেলে কোথায় ?

আজ্ঞে ওকে এক সার্কাস-অলার কাছ থেকে আড়াই টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, তখন এতটুকু ছিল। তারপর ওকে খেলা শিখিয়ে নিয়েছি। আমার কিছু জমি ছিল, খাজনার দায়ে নীলাম হ'য়ে গেল। ওকে নিয়ে ঘুরতাম, কে জমি জিরেত দেখে বলুন। ভালই হয়েছে, একটা পেট চলে গেলেই হ'ল।

কিন্তু এবার যে ঘরে বউ আনছ!

সেই তো ভাবনা।

বেশ ছিলে আবার কেন?

মুরলী মুষড়িয়া গেল, সেদিন সঞ্জীবের কথায় উৎসাহ পাইয়াছিল। এক সময়ে সকলে তাহাকে বিবাহ করিতে বলিত, যেমন প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিতকে লোকে বলিয়া থাকে। কিন্তু বয়স হইয়া গেলে আর কেহ বলিত না, এমন সময়ে সেদিন সঞ্জীব বলিল। সঞ্জীব তাহার কেহ নয়, পরিচিতও নয়, কিন্তু সেই জন্যই কথাটা তাহার কানে গুরুতর বোধ হইল, ভাবিল মুরুব্বি লোকের কথা অমান্য করা কিছু নয়। সংসারে মনের মতো কথা যে বলে তাহাকেই মুরুব্বি মনে হয়।

সঞ্জীব বলিল, এই দেখোনা কেন, আমি বিয়ে থা করিনি কেমন আছি, যখন যেখানে খুশী যাচ্ছি, যা খুশী করছি কেউ বলবার নেই।

বাবু আপনার এখন কাঁচা বয়স তাই চলে যাচ্ছে, আমার মতো বয়স হলে তখন বুঝবেন।

কাঁচা বয়স আর কত দিন থাকে, আমার বয়স যে প্রায় ত্রিশ হল।

দেড় কুড়ি তো ছেলে মানুষের বয়স হুজুর।

আচ্ছা তবে সেই কথাই রইলো, ঘরে বউ আনলে খবর দিয়ো।

এখানে কত দিন থাকবেন ?

শীগ্‌গীর নড়ছিনা, তোমাদের দেশ ভারি সুন্দর, দুঃখ হচ্ছে যে আগে আসিনি। চলো এখন নদীটা একবার দেখে আসি।

দুইজনে উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর ঠিক নীচেই নদী, অনেক নীচে।

নদীর এত কাছে বাড়ী, বান হলে—সব ভেসে যায় হুজুর, ও বছর গিয়েছিল, কিছু ছিল না। আবার সব নূতন করে তৈরি করি।

দুইজনে সন্তর্পণে পাড় বাহিয়া নামিয়া জলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই দিকে পাথরের চাপে নদীটা এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া খরবেগে বহিতেছে, যে পরিমাণে তাহার আয়তন কমিয়াছে সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে গর্জ্জন।

সঞ্জীব বলিল, উঃ কি শব্দ ?

এ আর কি শুনছেন হুজুর, বর্ষাকালে মনে হয় শাঁখ ফুকছে, জলের তোড়ে বাড়ীখানা কাঁপতে থাকে।

মুরলী বলিল, এখান থেকে পাথরডি পর্য্যন্ত দুই দিকে এমনি পাথর, কেউ যেন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে।

সঞ্জীব দেখিল দুই তীরের কালো কালো শ্লেট পাথরের ছায়া নদীর জলে পড়িয়াছে, নদীটা সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রায় আগাগোড়াই ছায়ার কালিমায় ম্লান। অজস্র ছোট বড় পাক চোরা পাথরের আভাস বহিতেছে, কোথাও বা জল কাঁপিয়া উঠিয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, ফেনাগুলা পাগলের মতো ছুটিয়া যাইতে যাইতে স্রোতের তীব্রতার প্রমাণ বহন করে। ওপারের পাড় খাড়া বলিয়া আর কিছু দেখা যায় না, কেবল দুরের উচ্চ গিরিমালার শিখর শ্রেণীর উঁকি-মারা ভঙ্গীটুকু দেখা যায়।

চলো এবারে ফিরি।

দুইজনে নদীর গর্ভ ছাড়িয়া মুরলীর বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সঞ্জীব দেখিল ওপারের মাঠ ক্রমে উঁচু হইয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের পায়ের কাছে বন, তারপরে দুইয়ে মিলিয়া বিচিত্র রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। পাহাড়ের মাঝে মাঝে খানিকটা করিয়া শাদা দাগ, বর্ষাকালে মাটি ধ্বসিয়া গিয়াছিল, এখনও ঘাস গজায় নাই; আর কোন কোন জায়গায় পাহাড়ের গা বরাবর শাদা একটা রেখা, উপরে উঠিবার পথ। শীতের রোদ আকাশ জোড়া প্রকাণ্ড একটা গাঁদা ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ নীলমণি, মুরলী প্রভৃতি যাবতীয় প্রসঙ্গ সে ভুলিয়া গেল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল সমস্ত চরাচর গুণীর বীণায় খরপ্রহত তন্ত্রীর মতো কাঁপিতেছে, সৌন্দর্য্যে, আনন্দে, সঙ্গীতে।

তাহার নিস্তব্ধ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া মুরলী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, একটা আস্ত সুস্থ লোক হঠাৎ এমন কাঠের মতো অসাড় হইয়া গেল কেন। খুব সম্ভব ভাবিল মাথায় কিছু গোল আছে, খুব সম্ভব ভাবিল বাবু আমাব নীলমণির মতোই, নীলমণিও মাঝে মাঝে এমনি তন্ময় উন্মনা হইয়া পড়িয়া থাকে কি না!

৭

ভবানী দেবী মাঝে মাঝে স্বামীকে বলেন, আমি একটা মেয়ে-মানুষ বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে কাজটুকু করি, তুমি আস্ত একটা পুরুষ মাঠে ঘাটে ঘুরে তা করতে পারো না, ছিঃ ছিঃ।

তাঁহার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ইতিমধ্যে তিনি পাঁপড়িকে মুড়ি মুড়কির ভেট জোগাইয়া নূতন ভাড়াটের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন তিনি পাঁপড়িকে ডাকিয়া আনিয়া এক আঁচল মুড়ি মুড়কি দিলেন, পাঁপড়ি যাইতে উদ্যত হইলে বলিলেন, আমার সম্মুখে বসে খা, তোকে অনেকদিন সামনে ব'সে খাওয়াইনি।

অগত্যা সে বসিয়া খাইতে সুরু করিল। মেয়েরা বাড়ীতে ছিল না, কাজেই গল্প করিবার অর্থাৎ গল্পের সূত্রে সারদাবাবুদের পরিচয় টানিয়া বাহির করিবার চমৎকার সুযোগ।

হাঁরে, তোর নূতন ভাড়াটে কেমন লোক, পেট ভ'রে খেতে দেয়?

আমার এতটুকুন পেট, তা আর ভরাতে কি লাগে!

এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল, তারপরে বলিল, ওরা খুব বড়লোক জানো মা ঠাকরুন।

আরে বড়লোক হলেই কি সবাই চাকরবাকরকে পেট ভ'রে খেতে দেয়!

তা যা বলেছ মা ঠাকরুন। সে বছর এক ভাড়াটে এসেছিল, তারাও বড়লোক, বড় বড় দুটো কুকুর এনেছিল। জানো মা ঠাকরুন কুকুরের জন্যে রোজ মাংস লাগতো এক সের। কিন্তু চাকরবাকরের ভাগ্যে একখানা হাড়ও জুটতো না।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

না, মা, গিন্নিমা খুব ভালো লোক।

আর বাবু?

সে-ও খুব ভালো, সারাদিন ব'সে গুড়গুড়ি টানে, আর

আমাকে দেখলেই বলে, পাঁপড়ি তোদের দেশে কিচ্ছু নেই, কেবল গুচ্ছের পাথর।

আর দাদাবাবু?

দাদাবাবু আবার কে?

কর্ত্তার ছেলে।

তাই বলো, তাকে তো আমি সন্তু বলে ডাকি। অতটুকু ছেলেকে আবার দাদাবাবু বল্‌বো? ভারি ব'য়ে গিয়েছে।

সে কেমন?

সারাদিন গিরগিটি মেরে বেড়ায়, আবার কেমন। জানো মা, একদিন একটা গিরগিটি মেরে এনে বলে, গোসাপ। সহরের ছেলে কিনা, কিছু জানে না।

এই বলিয়া পাড়াগাঁয়ের বিপুল অভিজ্ঞতার গৌরবে সে সোজা হইয়া বসিল।

তবে কাউকে দাদাবাবু বলিস নে?

পাঁপড়ির মনে হইল উক্ত অভিযোগ সহ্য করিলে হীনতা স্বীকার করা হয় তাই বলিল, বলি বই কি।

কা'কে?

ঐ মাষ্টার বাবুকে।

হাঁ, শুনেছি বটে এক মাষ্টার সঙ্গে এসেছে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল, মাষ্টার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসেনি কেন রে? বোমার মধ্যে তাদের ফেলে এসেছে, কেমন লোক!

ভবানীর কথা শেষ হইতে না হইতে পাঁপড়ি হাসিয়া উঠিল।

কি হ'লরে ?

দাদাবাবু বিয়েই করেনি, তার আবার ছেলে মেয়ে।

জানলি কি ক'রে ?

আমি যে একদিন তার ছেলেমেয়ের নাম জিজ্ঞাসা ক'রে ঠ'কে গিয়েছিলাম।

তোর সঙ্গে খুব গল্প করে বই কি!

ক্ষুদ্র বুকটি গৌরবে স্ফীত করিয়া বলিল, খুব গল্প করে। অনেক লেখাপড়া জানেন কি না।

কি গল্প হয় রে ?

পাহাড় আর বনজঙ্গলের গল্প।

সেও বুঝি বলে গুচ্ছের পাথর ?

না, মা, দাদাবাবু বলেন, পাঁপড়ি তোদের দেশ বড় সুন্দর, ভাবছি এখানেই আমি থেকে যাবো। সেদিন কাছিমদ গিয়েছিলেন তারই গল্প করছিলেন, বলছিলেন—

কাছিম দ'র বর্ণনা শুনিবার কিছুমাত্র আগ্রহ ভবানীর ছিল না, তিনি শুধালেন, তোর বাবুরা কি জাত রে ?

বামুন মা।'

জানলি কি ক'রে ?

কর্ত্তাবাবুর গলায় যে পৈতা আছে। গিন্নিমা বলছিলেন, এবারে ফিরে গিয়ে সন্তুর পৈতা দেবেন। আমাকে তখন নিয়ে যাবেন বলেছেন।

আর দাদাবাবু ?

ভবানী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করেন।

দাদাবাবুও বামুন, তাঁর গলাতেও পৈতা।

ভবানী মনে মনে বলিয়া ওঠেন, জয় মা রঙ্কিনী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো মা। রোগিনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

জানো মা সেদিন কর্ত্তা বাবু বলছিল—

আচ্ছা সে আর একদিন শুনবো, এখন তুই যা, নইলে ওরা আবার বকবে।

ভবানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, আর পাঁপড়ির মুড়ি চর্ব্বণ দেখিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না।

পাঁপড়ি ছাড়া পাইয়া অবশিষ্ট মুড়িগুলি খাইতে খাইতে চলিয়া গেল।

ভবানী ভাবিতে লাগিলেন মাষ্টার অবিবাহিত এবং ব্রাহ্মণ, আর মাষ্টার শব্দেই বোঝা যাইতেছে যাই হোক একটা চাকুরিও করে। তাঁহার মনে হইল এ যেন দূরের গঙ্গা রাতারাতি ঘরের দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে।

ছায়ার জন্য তাঁহার বড় দুশ্চিন্তা ছিল না, কলেজে পড়ে, দেখিতে সুশ্রী, ওর বর জুটিয়া যাইবে। তাঁহার যত দুশ্চিন্তা কায়ার জন্য, রঙ কালো, প্রথম পাশটাও করিতে পারে নাই, ভবানী জানিতেন ওর বর জুটাইয়া না দিতে পারিলে ওর বিবাহ হইবে না। আজকালকার ছেলেরা রঙ দেখিয়াই ভুলিয়া যায় কি না। কিন্তু বর জুটাইবে কে? স্বামী! অনেক দুঃখে তাঁহার হাসি আসিল।

অতঃপর অনেক কৌশলে ভবানী স্বামীকে দিয়া মাষ্টারকে চায়ের নিমন্ত্রণ করাইয়া বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। অবশ্য কৌশল ও উদ্দেশ্য দুটাই গোপন রাখিয়াছিলেন। মুখে বলিয়াছিলেন ওঁদের

তো নিমন্ত্রণ করা যাবে না, ওরা বড়লোক। একদিন ঐ মাষ্টারকে এনে চা খাওয়াওনা কেন?

বারান্দায় যখন তারিণী ও সঞ্জীব চা পান করিতেছিলেন, জানালার ফাঁকে ভবানী মাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। এখন রঙ্কিনী মার ইচ্ছা হইলেই হয়।

ভবানী মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন—তোমাদের এ কেমন শিক্ষা? ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছেন আর তোমরা লুকিয়ে আছো! যাও আলাপ পরিচয় করো, তোমাদের বাবা মুখচোরা মানুষ, ওখানে গেলে তাঁর সাহায্য করা হবে।

ছায়া বলিয়াছিল, থাক্ না মা, ওঁদের কথার মধ্যে গিয়ে আবার কি কাজ?

কায়া কিছু না বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অগত্যা ছায়াকেও সঙ্গে যাইতে হইয়াছিল।

সঞ্জীববাবু, এ দুটি আমার মেয়ে।

নমস্কার বিনিময়ের পালা শেষ হইয়া গেলে তারিণীবাবু বলিলেন—ছায়া কলেজে পড়ে, থার্ড-ইয়ার, ইংরাজীতে অনার নিয়েছে।

অনার্সের গৌরবহানিতে ছায়ার কান লাল হইয়া উঠিল।

আর কায়া বাড়ীতে থেকে ওর মাকে দেখাশোনা করে, তিনি অসুস্থ কি না।

কায়া কথা বলিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। পরিচয়ের ভূমিকা শেষ হইবামাত্র সুরু করিল—আপনাকে সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখি, কি খুঁজে বেড়ান?

কলেজে একসময়ে বটানি পড়েছিলাম, তখন যে-সব ফুলের

বিবরণ বইয়ের পাতায় দেখেছিলাম এখন সেগুলোকে মাঠে মাঠে খুঁজে বেড়াই। চেনা ফুল পাইনে, কিন্তু অচেনা ফুল জুটে যায়।

কায়া শুধায়—এখানকার ফুল কেমন দেখেন—সুন্দর ?

সবগুলো কি সুন্দর হয়। তবে এক আধটা খুব সুন্দর। এখানকার মাঠে এমন সুন্দর ফুল আছে আশা করিনি।

ছায়ার দুই ঠোঁটের ফাঁকে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা জাগে।

কায়া ভাবে সঞ্জীববাবু খুব একটা রসিকতা করিয়াছে, তা-ই সশব্দে হাসিয়া ওঠে।

আপনি বুঝি আগে এদিকে আসেন নি ?

না এই প্রথম। এখন মনে হচ্ছে আগে আসিনি কেন!

না আসলে বুঝি ঠকতেন ?

সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সঞ্জীবকে অপ্রস্তুত করিয়াছে ভাবিয়া কায়া আবার হাসিয়া উঠিল।

ছায়া সারাক্ষণ বসিয়া বসিয়া শতরঞ্চির সুতা ছিঁড়িতেছিল।

আপনি চুপ ক'রে আছেন কেন ?

কা'কে বলছেন ? আমাকে ? আমি কথা শুনতে ভালোবাসি, বলতে পারিনে।

তারিণীবাবু বলিলেন—সঞ্জীববাবু, ছেলেবেলা থেকে ওর ঐ রকম, মুখচোরা মেয়ে। ধ'রে মারলেও চুপ ক'রে থাকে, আবার একজোড়া বালা গড়িয়ে দিলেও চুপ ক'রে থাকে।

সেই জন্যে বাবা দিদিকে মাঝে মাঝে বুকি বলে ডাকে।

বুকিটা কি ? ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুধায় সঞ্জীব।

বোকার স্ত্রীলিঙ্গ—বলে কায়া।

সঞ্জীব হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, সেই হাসির দমকায় ছায়ার একটা ছোট চাহনি ঝড়ের অসহায়া কপোতীর মতো পাখা ঝট্‌পট করিয়া মরে।

এইরূপ অকারণ কথাবার্তার সঙ্গে তারিণী সম্পূর্ণ অপরিচিত। মেয়েরা আসিবার আগে ভদ্রতার কয়েকটি শিক্ষিত বাঁধা বুলি শেষ করিয়া তিনি সেই আধখোঁড়া ইঁদারাটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আর একটু হইলেই সঞ্জীবকে লইয়া তাহার মধ্যে পড়িতেন আর কি। এমন সময়ে মেয়েরা আসিয়া পড়ায় তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। এখন বলিয়া উঠিলেন, ছায়া মা তোমরা ওঁর সঙ্গে গল্প করো, আমি আসি।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ছায়ার কোলের কাছে পুঞ্জীভূত শতরঞ্চির সূতা লক্ষ্য করিয়া সঞ্জীব বলিল—আর কিছুক্ষণ এখানে বসে থাক্‌লে আপনি দেখছি সমস্ত শতরঞ্চিটাই ছিঁড়ে ফেলবেন, তার চেয়ে উঠুন।

সঞ্জীবের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল, এবারে ছায়াও হাসিল।

সঞ্জীব লক্ষ্য করিল হাসিলে ছায়ার দুই গালে ছোট্ট দুটি টোল পড়ে, আর কায়ার দাঁতের মাড়ি দেখা যায়।

উঠে কি হবে? শুধায় কায়া।

চলুন ঐ মাঠে আপনাদের ফুল চিনিয়ে আনি।

ছায়া বলে, আগে নিজে চিনতে শিখুন।

নিজে চিনেছি বলেই তো সাহস করে আপনাদের ডাকছি।

এখানকার মাঠের ঘাসের ফুল চিনতে ভুল হয়।

এ সব তো বুকির মতো কথা নয়।

বুকি বলেই তো ভরসা পাইনে।

কায়া ভাবিল, দিদি খুব মজার কথা বলিতেছে। তাই বলিল, না, সঞ্জীববাবু, দিদির কথা শুনবেন না। আপনি বটানি পড়েছেন, আপনার কেন ভুল হবে।

আমিও তো তাই ভাবি।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা মাঠের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল, আর সঞ্জীব ঘাসের ফুল তুলিয়া সংগ্রহ করিতে থাকিল।

ছায়া বলে—সঞ্জীববাবু অনেকগুলো তো তুল্‌লেন, ওতে এক-দিনের চচ্চড়ি কি হবে না ?

দিদি খাওয়ার কথা ছাড়া ভাবতেই পারে না।

আপনার সেই সুতোগুলো থাকলে এখন কাজে লাগতো, তোড়া বাঁধা যেতো। অভাবে এই লতাটা।

এই বলিয়া সে ছোট্ট একটি তোড়া বাঁধিল।

ফিরিবার সময়ে কায়া ঘাসের ফুলের তোড়াটি চাহিয়া লইল, বলিল, মাকে দেবো, মা খুশী হবেন।

আর যাই করো তোমার দিদির হাতে যেন না পড়ে, তাহলেই আমার এত কষ্টের ফুলে চচ্চড়ি ক'রে ফেলবে।

ছায়া বলে, খেতেও কম কষ্ট হবে না।

কায়া সত্যই তোড়াটি মায়ের হাতে দিয়াছিল এবং তোড়ার ইতিহাস শুনিয়া মা সত্যই খুশী হইয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আর তোড়াটি দেখিতে পাওয়া গেল না।

এই দিনের পর হইতে সঞ্জীব প্রায় প্রত্যহ অনেকটা সময় ছায়া ও কায়ার সঙ্গে কাটায়। ফুল চেনা, ফল চেনা, গাছপালা চেনা, গ্রহনক্ষত্র চেনা প্রভৃতি অনেক গুরুতর বিষয়ের হাতেকলমে আলোচনা হইয়া থাকে।

কলিকাতার গতানুগতিক সমাজে আলাপ পরিচয় পাকিতে কিছু সময় নেয়। কিন্তু এখানে বিদেশে খোলা মাঠের মধ্যে সমস্তই বেশ স্বচ্ছ, সরল, সহজ। এখানকার রৌদ্র এবং বায়ু, ফুল ও ফল পরিচয়কে অতি সত্বর অতি সঙ্গোপনে অতি নিপুণভাবে তাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দেয়।

৮

সারদাবাবু দুইখানা গোরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সপরিবারে ধারাগিরি ভ্রমণে চলিয়াছেন। বেশির মধ্যে আছে ছায়া আর কায়া। সামনের গাড়ীখানায়, সারদাবাবু গিন্নি এবং সন্তু; পিছনের গাড়ীতে তৈজসপত্র ও চালডাল সহ চাকরবাকর ও পাঁপড়ি, সকলের শেষে সঞ্জীব পদব্রজে, দুই পাশে ছায়া আর কায়া। তাহারা বলিয়াছে, আট মাইল পথ হেঁটে যাবো। গোরুর গাড়ীর চেয়ে তাতে আরাম বেশি।

ইতিমধ্যে মায়ের আগ্রহে ছায়া ও কায়া সারদাবাবুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কাছেই প্রথমে গিন্নি ধারাগিরির বর্ণনা শোনেন। তাহারা বলিয়াছিল কাকিমা একবার চলুন, পঞ্চাশ ফুট উঁচু থেকে ঝরণা পড়ছে, স্নান করতে খুব আরাম, আর পাহাড়ের শোভা কি চমৎকার।

গিন্নি সারদাবাবুকে বলিলেন—চলো না, দেখে আসা যাক্।

সারদাবাবু নৈরাশ্যের সুরে বলিলেন, তা চলো, এখানেও গুচ্ছের পাথর, সেখানেও তাই, ক্ষতি কি।

তারপর ছায়া ও কায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি শুধাইলেন, তা সেখানে বাঘ ভালুক নেই তো ?

ছায়া বলিল, আছে বই কি কাকাবাবু।

কায়া দেখিল সব মাটি হয়, তাড়াতাড়ি বলিল, দিনের বেলা কোন ভয় নাই, আমরা কতবার গিয়েছি। আর ও জায়গাটায় সর্ব্বদা লোকজন আছেই, কাঠ কেটে আনতে মোটর লরি যাচ্ছে, আরও কত লোক যাবে বনভোজন করতে।

সারদাবাবু অগত্যা বলিলেন, তা চলো, তোমাদের সকলেরই যখন ইচ্ছা।

সন্তু বলিল, বাবা আমি কিন্তু ঝরণার জলে স্নান করবো।

পাঁপড়ি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, জলের তোড়ে প'ড়ে গিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে যাবে।

সন্তু রাগিয়া বলিল, বেশ যায় যাবে আমার দাঁত যাবে, তোর তাতে কি ? তুই চুপ কর।

ভালো বলে বললাম, আবার রাগ করা হচ্ছে।

সন্তু ও পাঁপড়ির মধ্যে সারাক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা বাধিয়াই আছে।

অনেক শলাপরামর্শের পরে স্থির হইয়াছিল যে সেখানে খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া সন্ধ্যার আগে, সারদাবাবুর ভাষায় বাঘ ভালুক বাহির হইবার আগেই প্রত্যাবর্ত্তন করা হইবে।

সারদাবাবু শুধাইলেন, মাষ্টার মশাই আপনি যাবেন তো ?

সঞ্জীববাবু যে না যাইতেও পারেন এ সন্দেহ ছায়া কায়ার মনে হয় নাই।

সারদাবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া ছায়ার বুক ধুক্‌ধুক করিতে লাগিল। কায়া উচ্চস্বরে বলিল, নিশ্চয় যাবেন। সেখানে এত ফুল আছে যে উনি সেখানেই থেকে যাবেন।

বাঘের পেটে নাকি ? তবে এমন সুযোগ ছাড়া হবে না, যাবো বই কি !

ছায়ার মন প্রসন্ন হইল। কায়া আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি আগেই জানতাম, উনি না গিয়ে পারবেন না।

আগের দিন সন্ধ্যায় প্রসন্নময়ী ভবানীদেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, দিদি কাল আমি তোমার মেয়েদের নিয়ে ধারাগিরি যাচ্ছি।

ভবানী আনন্দে অনুমতি দিয়া বলিলেন, যাবে বই কি দিদি, ওরা তো এখন তোমারই মেয়ে।

মেয়েরা সর্ব্বদা পরস্পরকে দিদি বলে, কেউ কারো চেয়ে বয়সে বড় নয় প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে।

তারপরে বলিলেন, সুস্থ থাকলে আমিও তোমাদের সঙ্গ নিতাম দিদি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর ভালো লাগে না, এর চেয়ে মরণ হ'লেই বাঁচি।

সে কি কথা, সে কি কথা, অমন বল্‌তে নেই।

না দিদি আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই, কেবল মেয়ে দুটোর বিয়ে হচ্ছে না বলেই বুঝি প্রাণটা বের হচ্ছে না।

বিয়ে হবে বই কি! অমন লক্ষ্মী মেয়ে।

প্রসন্নময়ী মাঝে মাঝে তারিণী বাবুর বাড়ীতে আসিতেন, ভবানীদেবীর সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে।

নরসিংপুরের উত্তরদিকে ধারাগিরি নামে পাহাড়। দু'তিন সার পাহাড় অতিক্রম করিলে সেখানে পৌঁছানো যায়। সহরের সীমা ছাড়িতেই পথটা ঘন শাল বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, আর খানিকটা চলিলেই দু'দিকে বনের সঙ্গে পাহাড়ও দেখা দিতে সুরু করিবে। মন্থর গতিতে গাড়ী দু'খানা চলিয়াছে, গাড়ীর সঙ্গে তাল রাখিয়া ধীর পদে ডানে বাঁয়ে ছায়া ও কায়াকে লইয়া সঞ্জীব চলিয়াছে।

কায়া আজ তোমার দিদি খুব ফুলের চচ্চড়ি রাঁধবে।

দিদি ফুলের চচ্চড়ি রাঁধতে পারে, কিন্তু আর কোন রান্নায় আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না।

পারবে কি ক'রে কলেজে তো রান্না শেখানো হয় না!

সঞ্জীববাবু সেই ফুলের তোড়াটা পরে আর খুঁজে পেলাম না।

পাবে কি ক'রে! তারপরেই ওটা চচ্চড়ির সঙ্গে তোমাদের পেটে চলে গিয়েছে।

দুইদিকে সতেজ, সরল, সবল, শ্যামল শাল গাছ, বর্ম্ম পরিহিত ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদলের মতো প্রথম রৌদ্রে ঝকমক করিতেছে, বেশীক্ষণ তাকাইয়া দেখা যায় না।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ কি সুন্দর! ছায়া দেখো, দেখো।

কথাটা কায়ার কানে ভালো ঠেকিল না, বলিল, দিদি ওর কি বুঝবে? দিদি কল্‌কাতার মেয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কি বুঝবে?

সেই জন্যেই তো ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। তোমাকে বোঝাবার তো প্রয়োজন হয় না।

কায়া খুশী হইল।

ছায়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, মনে মনে ভাবিল সঞ্জীববাবুর কি কাণ্ড!

ঘাসের বিছানা শিশিরে শাদা। সঞ্জীব হঠাৎ পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিয়া ঘাসের উপরে খুব খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া আসিল।

কায়া শুধাইল, ওটা কি হ'ল?

শিশিরে পা ভিজিয়ে এলাম। তোমরা না থাকলে গড়াগড়ি ক'রে নিতাম।

ছায়া বলিল, আপনার ভাবগতিক অনেকটা নীলমণির মতো, সে অকারণে ঘাসের উপর গড়াগড়ি ক'রে নেয়।

মানুষে নাকি ভালুকের মতো হয়, আর তা ছাড়া দিদি তুমি ওঁকে ভালুক বল্‌লে—এটা অন্যায়।

কিছু অন্যায় নয় কায়া। সত্যি নীলমণির সঙ্গে আমার মিল আছে।

কি রকম শুনি।

আমরা দু'জনেই প্রকৃতির কোলের কাছে আছি।

নিন্। আপনার কবিত্ব রাখুন। আচ্ছা, সঞ্জীববাবু, আপনার আলুর দম ভালো লাগে না আলুর ঝাল?

তুমি যা রেঁধে দেবে তাই অমৃত, কি বলো ছায়া?

ছায়া বলে, খাদ্যের নামেই আপনার যেমন মুখ খুলেছে, সম্মুখে খাদ্য এলে কি হয় বলা যায় না।

তাই বলে ফুলের চচ্চড়িতে আমার রুচি নেই।

ভয় নেই সঞ্জীববাবু আজ আমি রাঁধবো।

সেই ভরসাতেই এসেছি। কায়া সাবধান, তোমার দিদিকে কিন্তু উনুনের কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না।......আচ্ছা ওটা কিসের টুং টুং শব্দ, গোরুর গলার ঘণ্টা নাকি?

সঞ্জীবের অজ্ঞতায় হাসিয়া কায়া বলিল, ও এক রকম পাখীর ডাক, টুং টুং শব্দ করে।

টুনটুনি পাখী বুঝি ?

এবারে ছায়া হাসিল।

দু'দিকে পাহাড় দেখা দিতে স্থরু করিয়াছে, পাহাড়ের কোলে আদিবাসীদের পরিচ্ছন্ন কুটীর। পাহাড়ের পায়ের কাছে গোরু চরিতেছে, তার পরেই ঘন শাল বনে ঢাকা পাহাড়ের প্রাচীর খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। এমন খাড়া যে কিভাবে মানুষ উপরে ওঠে সে-এক বিস্ময়। অথচ উপরে মানুষ উঠিয়াছে, কুঠারের ঠকাঠক, গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, গাছপালার অবকাশে মাঝে মাঝে কাঠুরের ছোট্ট পুতুল মূর্তিটা চোখে পড়ে।

ঐ দেখুন কেমন অদ্ভুত একটা পাখী।

কোথায় ?

ঐ যে শাল গাছের ডালে।

তাই তো!

সঞ্জীব দেখিল ঘন নীল একটা পাখী, কাঠ্ঠোকরার চেয়ে বড়, শকুনের চেয়ে ছোট।

আর ঐ দেখুন কি সুন্দর ফুল।

বাঃ! বাঃ!

ইন্দ্রধনুর সমস্তগুলা রঙ চুরি করিয়া প্রকাণ্ড একটি পুষ্প-স্তবক ঝুলিতেছে।

বোধ হয় কোন জাতের অর্কিড হবে, বলে সঞ্জীব।

আপনার না বটানি ছিল, ঠোকর দেয় কায়া।

সে দোষ আমার নয়, যারা বই লিখেছে তারা যে কখনো

ধারাগিরি আসে নি। ·······আমার ইচ্ছে করছে ঐ ফুল পেড়ে তোমার দিদিকে দিই।

ক্ষুণ্ণভাবে কায়া বলে, আমাকে বুঝি কিছু দিতে নেই?

কায়া রাগ করো না, তোমাকে দিতে ইচ্ছা করে বড় বড় লাউ কুমড়ো ঝিঙে, যাকে যা মানায়।

খুশী ভাবে কায়া বলিল, তাই বলুন।

ছায়া ভাবিল, নাঃ সঞ্জীববাবুকে আর বিশ্বাস নাই, কখন বেফাঁস বলিয়া বসেন।

পিছনের গাড়ী হইতে পাঁপড়ি ডাক দিয়া বলিল, দাদাবাবু আর একটু পরেই বাসাডেরা পাহাড়'। পাহাড়ের উপর দিয়ে যখন গাড়ী যাবে সাবধানে যাবেন, পা ফসকালেই একেবারে—

কথাটা এতই মজার যে সে আর শেষ করিতে পারিল না, হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কায়া ধমক দিয়া বলিল—তুমি এখন চুপ করো গিন্নি মা আমরা অনেক পাহাড় পার হ'য়েছি।

পড়েওছো অনেক, সে আবার হাসিয়া ওঠে।

আবার ফের্, থাম্।

সাতজুড়ির নালা পার হইয়া গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। বাসাডেরা নামে পাহাড়টা পার হইয়া ধারাগিরি পৌঁছিতে হয়।

সারদাবাবু ডাকিয়া বলিলেন, মাষ্টার মশাই, এযে আবার পাহাড়ে ওঠে!

আজ্ঞে, এই পাহাড়টুকু পার হ'তে হবে!

সারদাবাবু সমতলচর জীব, পাহাড়পর্ব্বত দেখিয়া বিব্রত বোধ

করিতেছিলেন, কিন্তু এখন আর উপায় নাই তাই অগত্যা অপ্রসন্ন মনে চুপ করিয়া রহিলেন।

পাহাড়ের সানুতে আগাগোড়া শিউলি বন, শত শত শিউলি গাছ, গাছগুলাও পাহাড়ী মাপের, আকারে বনস্পতিতুল্য। তখন ফুলের সময় নয়, তবু ফুলের অপ্রতুলতা নাই, সুগন্ধে বাতাস আবিল, শরৎকালে না জানি কি হয়।

সঞ্জীব বলিল, দেখেছো, দেখেছো কত শিউলি গাছ, এ যে বন দেখছি।

কায়া বলিল, আমরা একবার পূজোর সময়ে এসেছিলাম, ভুঁই ফুলে শাদা হ'য়েছিল, না দিদি?

আহা, চচ্চড়ি রাঁধবার কি সুযোগই না গিয়েছে!

ছায়া বলে,—কি ক'রে রাঁধা হবে, আপনি তো তখন তোড়া বাঁধবার জন্যে ছিলেন না।

কায়া বলে, কেমন হ'ল তো সঞ্জীববাবু, দিদি মুখ খোলে না বটে কিন্তু খুললে একেবারে ক্ষুরধার।

বলো বঁটির ধার।

পাহাড়ের উপরে সরু পথ, একখানা মোটর লরি অনায়াসে চলিতে পারে। বাঁয়ে পাহাড় আকাশে হেলান দিয়া উঠিয়া গিয়াছে, গায়ে ঘন শাল বন। ডানদিকে সুগভীর খাদ। খাদের গায়ও শাল বন, আর নীচে, কত নীচে অনুমানের অসাধ্য জলধারার ক্ষীণ রেখা, কিন্তু গর্জ্জন শুনিলে বুঝিতে পারা যায় নিতান্ত ক্ষীণ নয়। নদীর সেই উৎপতিত গর্জ্জন ও কচিৎ পাখীর চকিত রব ছাড়া সমস্ত নিস্তব্ধ। প্রকাণ্ড আকাশটা যেন নিস্তব্ধতায় ঠাসিয়া বোঝাই করা, যেন তাহার পাশ ফিরিবার শব্দ অনুভব করিতে

পারা যায়। সেই ভীম ভৈরব সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া দেখিবার মতো বটে।

গাড়ী দু'খানা অগ্রসর হইয়া গেল, সঞ্জীব ও ছায়া আর কায়া সেখানে দাঁড়াইল।

সঞ্জীব বলিল, এমন জায়গায় এলে নিতান্ত নীরস লোকের মনেও কবিত্ব জাগে।

ছায়া বলিল, আপনি ঠিক বলেছেন।

কায়া ভাবিল, কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, আপনি বুঝি কবিতা লেখেন?

না কবিতা আমি লিখি না।

ছায়া বলিল, আপনার নামে একজন লেখকের গল্প আমি প্রবাসীতে পড়েছি।

আমার নামে লেখক? তা হবে! চলো, ওঁরা এগিয়ে গিয়েছেন।

বাঁ দিকে পর্ব্বত গাত্র ঘন শ্যামল পর্ণজাতীয় গুল্মে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে লতাগুল্মে অপরিচিত বিচিত্র ফুল।

একটি গাঢ় লাল ফুলের গুচ্ছ তুলিবার উদ্দেশ্যে কায়া যেমনি পর্ণাঙ্গের বনে ঢুকিয়াছে অমনি এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিল। তাহার পায়ের নাড়া খাইয়া চকিতের মধ্যে হাজার হাজার সোনার রঙের প্রজাপতি উড়িয়া উঠিল, প্রজাপতির ডানায় সেখানকার আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাদের তিনজনকে আবৃত করিয়া ফেলিল। ব্যাপারটা এমনি সুন্দর, এমনি অভাবিত যে তাহারা বিস্ময় বোধ করিতেও ভুলিয়া গেল। কিন্তু কেবল ক্ষণকাল মাত্র। মুহূর্ত্ত পরেই সব কোথায় মিলাইয়া গেল। বনের প্রজাপতি বনে

মিশিল। আবির্ভাব ও তিরোভাব দুই-ই যেন জাদুমন্ত্রে ঘটিল।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সঞ্জীব বলিয়া উঠিল, কি কাণ্ড ঘটলো দেখলে? যেন হাজার হাজার পারিজাতের পাঁপড়ি ঝ'রে পড়ল।

কায়া বলিল, দিদি ভাবছে মুঠো মুঠো গরম আলুভাজা ছড়িয়ে দিল।

দিদি কি ভাবছে দিদিই বলুক না, কি ছায়া?

হাজার হাজার মোহর বৃষ্টি হ'য়ে গেল।

শুনলে কায়া? তা পারিজাতের দল, আলুভাজা, মোহর এখন সব থাক। পা চালিয়ে চলো।

পাহাড়ের নীচে নামিয়াই তাহারা গাড়ীর সঙ্গ পাইল, আর শুনিতে পাইল যে সারদাবাবুর সঙ্গে তাহাদের গাড়ীর গাড়োয়ান নকুড়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

হাঁ নকুড়ে, আমগাছের সঙ্গে ওই মানুষ প্রমাণ উঁচু ক'রে বাঁধা মাচাটা কিসের জন্য?

এটা তো বাবু হাতী খেদাবার মাচা।

হাতী? হাতী কোথায়?

এই পাহাড়েই কোথাও আছে, ধান খাওয়ার জন্যে নামে।

বল কি?

ঐ দেখছেন না ভাঙা ডালগুলো, ওরাই ভেঙেছে।

বোধ হয় দু'চার দিন আগে।

না বাবু কাঁচা ডাল, বোধ করি কাল রাতে ভাঙা।

তা সব জেনে শুনে এখানে আনলে কেন?

ভয় কিসের বাবু ওরা সন্ধ্যার আগে নামে.না। আর নামলেই বা কি। মানুষের সামনে পড়লেও মানুষকে ওরা কিছু করে না।

নাও এখন খুব হ'য়েছে, এখন তাড়াতাড়ি চলো, সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে।

এই বলিয়া খুব সম্ভব তিনি নীরবে আপন মনে জাপানী বোমার সহিত বনের হাতীর তুলনামূলক আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ছোট একখানা উপত্যকা পার হইয়া গাড়ী আসিয়া ধারাগিরির কাছে থামিল। নকুড় বলিল—গাড়ী আর এগোবে না, আপনারা হেঁটে এগিয়ে যান। আমরা জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছি।

সকলে নামিয়া হাঁটিয়া চলিল। এখানে পাহাড়টা দুই বাহুর দ্বারা একটা কোণ সৃষ্টি করিয়াছে, নীচে শাল, পিয়াশাল, অর্জ্জুন, কেঁদ প্রভৃতির ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের বাহির হইতেই ঝরণার শব্দ শোনা যায়। কায়া বলিয়া উঠিল, কাকিমা, ঐ ধারাগিরির ঝরণার শব্দ। জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে দেখিল, প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ ফুট উঁচু হইতে একটা ঝরণার ধারা একলাফে নীচে পড়িতেছে। যেখানে পড়িতেছে সেখানে একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। জল স্বচ্ছ ও গভীর। ইতস্ততঃ ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড। এখানেই বনভোজনের স্থান।

সঞ্জীব বলিল, সারদাবাবু, এইজন্যেই আমাদের দেশে পাহাড়কে মহাদেব বলেছে, কমণ্ডলু থেকে জলদান করছেন।

সারদাবাবু অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, কাছেই কোথাও সিদ্ধিদাতা গণেশও আছেন, এখন তিনি দর্শন দেবার আগে ফিরতে পারলে হয়।

সঞ্জীব বলিল, নন্দী-ভৃঙ্গীরও অভাব হবে না, বাঘ ভালুকও আছে।

সারদাবাবু স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, নাও তাড়াতাড়ি রান্নার জোগাড় ক'রে নাও।

চাকরেরা পাথর সাজাইয়া উনুন তৈরি করিয়া দিল।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, কায়া মা, তোমার ভরসাতেই এসেছি, আমি মোটা মানুষ একা পেরে উঠ্‌বো না।

কায়া বলিল, কিছু ভয় নেই কাকিমা, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

রাঁধাবাড়ায় কায়ার বড় উৎসাহ।

সন্তু ও পাঁপড়িতে বচসা বাধিয়া গিয়াছে।

সন্তু বলিতেছে, বাবা আমি ঐ পুকুরে স্নান করবো।

পাঁপড়ি উত্তর দিতেছে, নামোনা একবার, ওখানে জটাবুড়ী আছে, পা ধ'রে টেনে নিয়ে যাবে।

তুই চুপ কর্ জটাবুড়ী।

আসল জটাবুড়ী তো দেখনি, তা যাওনা একবার।

সঞ্জীব কায়াকে বলিল, তোমরা রান্নার জোগাড় করো, আমি তোমার দিদিকে নিয়ে ফুল সংগ্রহ ক'রে আনি, ধারাগিরিতে এসে চচ্চড়ি না খেলে আসাই বৃথা। চলো ছায়া।

ছায়ার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল, তবু না গিয়া পারিল না, মন্থরপদে সঞ্জীবকে অনুসরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

৯

সঞ্জীব ও ছায়া শুঁড়ি পথে পাহাড়টার উপরে উঠিল। সেখান হইতে জলধারা নীচে লাফ দিয়াছে তাহার কাছে দু'জনে দু'খানি পাথরের উপরে মুখোমুখী বসিল। সেখানটা পাহাড়ী বাঁশ ও কেঁদ গাছে আচ্ছন্ন। নিকটেই খানিকটা সদ্য খিন্ন মাটি দেখিয়া ছায়া শুধাইল—ও গর্ত্তটা কি ক'রে হ'ল ?

মনে হচ্ছে বুনো শূয়রে খুঁড়েছে।

শূয়র আছে নাকি ?

অভাব কি। পাহাড়ে সব রকম জানোয়ারই আছে।

তারপর আলোছায়ার ষড়যন্ত্রে পাতা ফাঁদগুলা দেখিয়া এবং হাতঘড়ি লক্ষ্য করিয়া সঞ্জীব বলিল, দেখো এখন বেলা দশটা, অথচ আলোর তেজ দেখে মনে হয় ভোরের আলো।

এখানে সন্ধ্যা বোধ করি তাড়াতাড়ি হয়।

হয় বই কি। সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে গেলেই অন্ধকার হ'য়ে আসবে।

তবে তো তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

সে ওয়ার্ণিং দেবার জন্য সারদাবাবু আছেন, তোমার ভাবনা নেই।

ছায়া হাসিল।

ছায়া বড় হাসে না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারা যায় তাহার মনে হাসির ফল্গুধারা নিরন্তর বহমান, সঞ্জীব বালু খুঁড়িয়া হাসির অঞ্জলি অনেকবার পান করিয়াছে।

ছায়া, তুমি কতদিন এখানে থাকবে ?

কলেজ তো বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, কাজেই বেশ কিছুদিন আছি মনে হয়।

চমৎকার।

আপনি কতদিন আছেন?

সারদাবাবুরা তো শীগ্‌গীর ফিরছেন মনে হয় না। আর যদি হঠাৎ ফিরে যান আমি থেকেই যাবো।

হঠাৎ এমন শখ কেন?

'এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে'।

শুধু কি দেশেরই গুণ না আর কোন কারণ আছে?

আছে বই কি।

ছায়ার বুক দুর দুর করিতে থাকে, শুনিতে কৌতূহল ও ভীতি অথচ না শুনিলেও নয়, শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করে—কি?

'হাঁ গো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে
তাহারে শুধানু হেসে
যেমনি।
ভরা ঘট ছলছলি
কোন কথা নাহি বলি
নত আঁখে গেল চলি
তরুণী।'

ছায়া ভাবে বুড়া কি সকলের মনের কথাই জানিতেন। মুখে বলে, এখানকার তরুণীরা তো নিরুত্তর থাকে না, আবার কথায় কথায় হাসেও।

আবার ফুলের চচ্চড়িও রাঁধে।

রাঁধতে আর দিলেন কই ?

তারপর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলে, না ভারি অন্যায় হচ্ছে, ওঁরা সব রাঁধছেন, আর আমি ব'সে আড্ডা দিচ্ছি।

ব্যস্ত হইয়া ওঠে কিন্তু বসিয়াই থাকে।

সঞ্জীব বলে, চুপ ক'রে ব'সে থাকো তো।

মুখ বুজে কি থাকা যায় ?

মুখ বুজে থাকলেই কি মনের কথা চাপা থাকে ?

কেবলি বাজে কথা বলেন।

বাজে কথা! তোমার উঠবার ইচ্ছে নাই। সত্যি কি না ?

মোটেই না, বলিয়া সে উঠিয়া পড়ে, সঞ্জীব তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বসাইয়া দেয়, বলে, বোস!

ছায়ার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে, সুখ না দুঃখ, ভয় না ঔৎসুক্য বুঝিতে পারে না।

সৌন্দর্য্য ও যৌবন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে দণ্ডপলে বোনা প্রহরের জাল কোন্ জাদুতে যেন অতিক্রান্ত হইয়া যায়, যেমন এই পাহাড় ও বনশ্রী আলোছায়ার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে অতিক্রম করিয়াছে।

ছায়াকে টানিয়া লইয়া যাওয়া কায়ার ভালো লাগে নাই। তাহার কোথায় যেন একটুখানি খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। কোথায় ? মনের কল্পনায় না হৃদয়ের ব্যথায় ? ঈর্ষ্যার দংশন না কৌতূহলের খোঁচা কিছুই সে বুঝিতে পারে না। চোরকাঁটা যেমন চলার তালে তালে পা হইতে উঠিতে উঠিতে কাপড়-চোপড়ের ভাঁজে কোথায় আত্মগোপন করিয়া তীক্ষ্ণভাবে জানান দিতে

থাকে, অথচ কোথায় না জানার দরুণ তুলিয়া ফেলা সম্ভব হয় না, কায়ার তেমনি অবস্থা হইয়াছে। তার উপরে আবার ব্যথার খোলা জানালা দিয়া সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার খোলা জানলাগুলা চোখে পড়িতে লাগিল। ছায়ার প্রতি সঞ্জীবের ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, সমস্তই নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিল। তাহার মনে হইল সেদিনের সেই ফুলের তোড়া দেওয়া কেবল ঠাট্টা মাত্র নয়। সঞ্জীব-সম্বন্ধে ছায়ার নীরবতাকে এক সময়ে উদাসীনতা মনে করিয়া সে খুশী হইয়াছিল, এখন বুঝিল তার অর্থ অন্যরূপ, মৌমাছি মধুতে মুখ ডুবাইয়া পান করিতেছে তাই নীরব। এমন সময়ে রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উপরের দিকে গেল, দেখিল পাহাড়ের উপরে গাছপালার আড়ালে যুগল নরনারী মুখোমুখী আসীন। সবটা স্পষ্ট না দেখিতে পাইলেও তাহাদের পরিচয় সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় থাকিল না। তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ঈর্ষ্যার সঙ্গে ক্রোধ যোগ দিল। কায়ার যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলে বুঝিত ঈর্ষ্যা বহুরূপী, কখনো ক্রোধের আকারে, কখনো হিংসার আকারে দেখা দেয়। সে ভাবিল, বাঃ আমরা খাটিয়া মরিতেছি আর দিদি বেশ স্বার্থপরের মতো একা বসিয়া গল্প করিতেছে। আর সঞ্জীববাবুই বা কেমন ভদ্রলোক। কিন্তু ক্রোধও দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। তাহার দু'চোখে ধারা নামিল।

প্রসন্নময়ী শুধাইলেন, কি হ'ল মা?

ধোঁয়ার জ্বালায় আর পারিনে।

সত্যি বড় ধোঁয়া।

দাঁড়াও কাকিমা, দিদিকে ডেকে আনি, সে এসে খানিকটা করুক।

কায়া পাহাড়ের দিকে চলিল।

ছায়া ও সঞ্জীব যদি কায়ার পাশে বসিয়া ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিত, তবে তাহার এত বাজিত না, কিন্তু ঐ যে দূরত্ব তাহাতেই সব বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, সঞ্জীব ও ছায়ার সম্বন্ধ ক্রূর রহস্যময় হইয়া কায়ার বুকে ছুরি বসাইতে উদ্যত হইয়াছে।

তাহাদের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বিনা ভূমিকায় সে বলিয়া উঠিল—দিদি, একবার রান্নার কাছে চলো।

তাহারা কায়ার অকস্মাৎ আবির্ভাবে হতচকিত হইয়া তাকাইয়া দেখিল তাহার মুখ লাল, চোখে জল।

সঞ্জীব শুধাইল, কি হ'ল তোমার?

ধোঁয়াতে মানুষ ওখানে টিকতে পারে? আমি আর পারছিনে, তুমি চলো।

এই বলিয়া সে ছায়ার দিকে তাকাইল।

সঞ্জীব বলিল, তখনি বলেছিলাম শুকনো কাঠ আনতে।

খুব হয়েছে, এখন থামুন।

কায়ার উষ্মায় সঞ্জীব বিস্মিত বোধ করিল।

কিন্তু ছায়ার কিছুমাত্র বিস্ময় ছিল না, সে বলিল, চল্।

এই বলিয়া সঞ্জীবের দিকে একবারও না তাকাইয়া, একটিমাত্রও কথা না বলিয়া কায়াকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

সঞ্জীব কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অগত্যা উঠিয়া পড়িল।

খাইতে বসিয়া ছায়ার মুখে সমস্ত খাদ্য বিস্বাদ বোধ হইতে লাগিল। এতক্ষণে ছায়ার মুখ দেখিয়া কায়া কেমন যেন স্বস্তি বোধ করিল, অসিদ্ধ মাংস তাহার পরম উপাদেয় বোধ হইল।

ফিরিবার পথে ছায়া সঞ্জীববাবুকে এড়াইয়া চলিল এবং কায়াও

দেখিল তাহারা না জোট বাঁধিতে পারে। তাহার খবরদারির আবশ্যক ছিল না, ছায়া নিজেই ঠিক করিয়াছিল, সঞ্জীববাবুর সঙ্গে আর মিশিবে না। তাহারা দু'জনে এক গাড়ীতে উঠিল। সঞ্জীব একাকী হাঁটিয়া চলিল। প্রকৃতির রূপের সত্যই সে রসিক। কিন্তু এখন সমস্তই কেমন তাহার বিরস মনে হইতে লাগিল। ঐ গিরিশিখরের ভৈমীকান্তি, এই উপত্যকার গা-ছমছম-করানো রহস্য, ঐ গিরিচূড়ায় চতুর্থীর চন্দ্র, অরণ্যের অকাল ঝিল্লি, নিস্তব্ধতার রক্তকল্লোল ধ্বনির মতো ঝরণার অবিরাম ঝর্ঝর, সমস্তই বিস্বাদ, কোথায় যেন লাবণ্যের অভাব ঘটিয়াছে, তাই সমস্তই এমন হতশ্রী।

১০

মুরলীর সঙ্গে সঞ্জীবের অনেকদিন দেখা হয় নাই। সঞ্জীব ভাবিল একবার তাহার সন্ধান লইলে হয়, তাই সে মুরলীর বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর কাছে পৌঁছিতেই তাহার চোখে পড়িল উঠানে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে তারস্বরে অনর্গল বকিয়া যাইতেছে। সে অনুমান করিল মেয়েটি মুরলীর নবাগতা গৃহলক্ষ্মী। মুরলী সেদিন বলিয়াছিল মেয়েটি ডাগর। সঞ্জীব বুঝিল মুরলী কিছু কম বলিয়াছিল, এখন দেখিল একেবারে পূর্ণ বিকশিত, মুখে খই ফুটিতেছে।

মুরলী শুনিতে পাইল মেয়েটি বলিতেছে, তখন বলা হ'য়েছিল

পাকাবাড়ী, এসে দেখি একখানা খাপরার ঘর, ধাক্কা দিলে প'ড়ে যায়। মরি মরি।

সঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া মুরলী বলিল, আসুন বাবু, আসুন।

তারপরে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল, এখন চুপ কর্ ইন্দু, বাবু এসেছেন।

কিন্তু পূর্ণ বিকশিত ইন্দু চুপ করিবার পাত্রী নয়, গলা আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া সে বলিল, শেষে এক ভালুক-অলার সঙ্গে বিয়ে হ'ল, লোকে বলবে ভালুকউলী! কপাল! কপাল।

বলিয়া উক্ত প্রত্যঙ্গে বার কয়েক চপেটাঘাত করিল।

সঞ্জীব দেখিল রাহুগ্রস্ত ইন্দুর সহিত ইন্দুর রঙের সাদৃশ্য আছে, সীঁথিতে হিন্দুস্থানী মেয়েদের ধরণে চওড়া করিয়া সিন্দুর আঁকা, পরণে ময়ুরকণ্ঠী একখানা শাড়ী, মেয়েটির মুখে চোখে বুদ্ধির খরতা এবং চিবুকে দৃঢ়তা।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কি করা কর্ত্তব্য, কি বলা উচিত সে ভাবিতেছে, এমন সময়ে মুরলী বলিল, এখন বাবুকে বসতে দে।

একখানা চারপায়া অগ্রসর করিয়া দিয়া ইন্দু বলিল, বসুন বাবু।

সঞ্জীব বসিলে পূর্ব্বতন পর্য্যায় আবার সে সুরু করিল, বাবু, আপনিই বিচার করুন। লোকটা আমার ভাইদের বুঝিয়েছিল দশ বারো বিঘা জমি আছে। জমি না ছাই। একখানা ভাঙা ঘর, আর একটা ভালুক।

সঞ্জীব বলিল, তুমি ঘরে এসেছ, এখন ক্রমে ক্রমে সব হবে।

তা হবে জানি। কিন্তু আগে ঐ ভালুকটাকে আমি তাড়াবো। আবার শখ করে নাম দেওয়া হয়েছে নীলমণি। লোকে ডাকে

ওকে নীলমণির বাপ বলে। আমাকে এখন নীলমণির মা বলতে আরম্ভ করবে, কি বলেন বাবু?

উত্তর মুরলী দিল, বলিল, তাইতো বল্‌বেরে, আমাদের সম্বন্ধই যে ঐ রকম।

ইন্দু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, সঞ্জীব দেখিল সুবিন্যস্ত দন্তপঙ্‌ক্তির মাঝের একটি দাঁত অর্দ্ধ-ভগ্ন।

শুন্‌লেন বাবু কথা, গা জ্বলে যায় না?

সঞ্জীব বুঝিল ইন্দুর উদয়ে প্রভু যে কেবল হীনবল তাই নয়, সহচরেরাও বিশেষ নির্বীর্য্য। সুরকি নীরবে ছাইগাদার উপরে উপবিষ্ট, মুন্সী কোথায় অন্তর্হিত আর নীলমণি শিকলে বদ্ধ অবস্থায় মৌনতা অবলম্বন করিয়াছে। কাহারো মুখে রা নাই, বেশ বুঝিতে পারা যায় কাহারো মনে উল্লাস নাই।

সেদিন প্রভুর মাথায় হলদে পাগড়িটা নীলমণির ভাল লাগে নাই, আসন্ন আশঙ্কার আভাসস্বরূপ লাগিয়াছিল, এখন সমস্তই সে বুঝিতে পারিতেছে। ইন্দু আসিবার পর হইতে মুরলীর ভালুক নাচানো বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আগে নীলমণি দুবেলা ভাত পাইত, এখন তাহা বন্ধ, কোন কোন দিন একটুখানি ফেন জল পায় মুরলী উইয়ের বাসা, ফলমূলটা না আনিয়া দিলে এতদিনে বোধ করি সে অনাহারে মরিত।

ইন্দু বলিল, বড় লোক বাড়ীতে এলেই চলে না, বড় লোকের আদর করতে জানা চাই। বসুন বাবু আমি চা এনে দিচ্ছি।

এই বলিয়া ইন্দু ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

সঞ্জীব বলিল, চা এখন থাক না।

মুরলী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, না বাবু চা না খেয়ে যাবেন না।

সঞ্জীব বুঝিল, চা অগ্রাহ্য করিয়া গেলে মুরলীকে আর একদফা সহ্য করিতে হইবে।

এনামেলের পেয়ালায় চা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া ইন্দু বলিল, বলুন তো বাবু এর আগে এ বাড়ীতে কখনো চা পেয়েছেন?

মুরলী বলিয়া উঠিল, একদিন তো মাত্র এসেছেন।

তাই বলে চা দিতে নাই! আমাদের বাড়ীতে কত দারোগা, জমাদার আসছে, কারো চা না খেয়ে যাওয়ার উপায় আছে!

তারপরে মুরলীর দিকে একটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানিয়া বলিল, ভালুক-অলার আবার ও সব জ্ঞান হবে কি ক'রে!

সঞ্জীব বলিল, ঘরে লক্ষী এসেছে এখন সবাই সব পাবে। পুরুষ তো লক্ষীছাড়া।

ইন্দু বিগলিত হইয়া গিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং আরম্ভ করিল, বাবু এই ব্যবসাটা কি ভালো?

কোন্ ব্যবসা?

এই গাঁয়ে গাঁয়ে ভালুক নাচিয়ে বেড়ানো।

আমি সেদিন ওকে জমিজিরেৎ করতে বলেছিলাম।

চাষ-বাস করবে ও? তবেই হয়েছে।

কেন?

'কেন'র সরাসরি উত্তর না দিয়া ইন্দু বলিল, আমার ভাইরা ওকে বলছে, আমার কারখানায় চলো। সাহেবকে ধরে চাকরি জোগাড় ক'রে দেবো। বুঝলেন বাবু, সেখানে হপ্তায় হপ্তায় নগদ টাকা, সরকারী বাসা। আবার কি চাই। তার উপরে বিনা পয়সায় সরকারী আলো, জল, রেশন, হপ্তায় দুই দিন

সিনেমার ছবি। আপনিই বলুন আমাদের মতো লোকের আর কি চাই!

তা বটে।

শুনলি তো এখন! বড় লোকের মুখে বড় লোকের মতো কথা।

তা ও কি বলে?

বলে, আমার নীলমণির কি হবে। আরে নীলমণি তোর ছেলে না নাতি, অসুখে মুখে জল দেবে না মরলে মুখে আগুন দেবে?

কিন্তু সত্যই তো ভালুকটার কি হবে?

আমার ভাই বলেছে কারখানার বড় সাহেবকে বলে কিনিয়ে দেবে। না হয় সার্কাসওয়ালার কাছে বেচে দাও, দুপয়সা আসবে। আমার থাকবার মধ্যে তো এই—

বলিয়া একবার কান ও হাত দেখাইয়া দিল, রূপোর দুল ও চুড়ি।

বেশ তো, মন্দ কি মুরলী?

বাবু, মরে গেলেও আমি কারখানায় যেতে পারবো না। সন্ধ্যা বেলায় যখন সব কারখানা থেকে বেরোয় দেখেছেন কি বাবু! সব ভূত, ভূত, কালিঝুলি মেখে সব ভূত।

আহা আমার কি রাজপুত্তুর রে! মাথায় পাগড়ি বেঁধে রোদে বৃষ্টিতে গাঁয়ে গাঁয়ে ভালুক নিয়ে বেড়ানো।

জানিস আমাকে লোকে কত খাতির করে, আর তোর কারখানার মজুর ভাই দুবেলা উঠ্‌তে বসতে সাহেবের লাথি খায়।

সঞ্জীব প্রমাদ গণিল, এবার ভাইয়ের ভগ্নী না জানি কি কাণ্ড করিয়া বসিবে। কিন্তু রহস্যময়ী নারী কখন্ যে কি করিবে তাহার কি স্থিরতা আছে?

সেদিন আর নেই। এখন সাহেবরা লাল ঝাণ্ডার ভয়ে কাবু।

বটে। ঐ যে তিন মাস ধর্ম্মঘট চল্‌ল—লাল ঝাণ্ডা কি করতে পেরেছিল? কারো ঘরে কি একখানা থালা ঘটি বাটি আছে, সব যে বেচে খেতে হ'য়েছে, না বাবু, আমি ওর মধ্যে নেই।

কারখানায় ধর্ম্মঘট হ'তে পারে আর তোর ভালুক মরতে পারে না?

সাবধান ইন্দু অমন কথা আর বলিস নে।

বলবো বলবো একশো বার বলবো, মরুক মরুক তোর ভালুক মরুক।

লাগুক, লাগুক, তোর কারখানায় ধর্ম্মঘট লাগুক। তোর ভাই বউয়ের চুড়ি বেচে চাল ডাল কিনুক। কেমন হ'লতো?

কি এত বড় কথা, এই চল্‌লাম আমি বাপের বাড়ী—

বলিয়া সে আরও কায়েম হইয়া বসিল।

সঞ্জীব বলিল, দেখো তোমরা স্ত্রীপুরুষে যদি ঝগড়া করো তবে আমি চল্‌লাম।

না না বাবু উঠবেন না।

বলিয়া দু'জনে হাত জোড় করিল। আসল কথা একটি মধ্যস্থ না থাকিলে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই।

হঠাৎ ইন্দু গৃহে প্রবেশ করিল এবং বাহিরে আসিয়া মুরলীর হাতে একটা সিকি দিয়া বলিল, যাও হরির দোকান থেকে দু'টো মিষ্টি কিনে নিয়ে এসো।

সঞ্জীব বলিল, ওসব আবার কেন?

তা কি হয় বাবু, আপনার পায়ের ধুলো যখন পড়েছে। যাও।

মুরলী প্রস্থান করিল। ইন্দু এতদিন শ্রোতাবিহীন ঝগড়া করিয়া অবসন্ন বোধ করিতেছিল, আজ সঞ্জীব সে অভাব মোচন

করিয়াছে, তাহার পিত্রালয়ের শিক্ষা চোখে দেখিয়াছে, কানে শুনিয়াছে, তাই তাহার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। এমন লোককে মিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভন না দেখাইলে ভবিষ্যতে হয়তো আবার শ্রোতাহীন কলহ করিতে হইবে এই তার আশঙ্কা।

বাবু আপনি একটু বসুন, আমি হাতের কাজটা চট্ ক'রে সেরে আসি।

ইন্দু ঘরে ঢুকিলে হর-পার্ব্বতী সম্বাদের অবকাশে সঞ্জীব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

গৃহকর্ত্রীকে অন্তর্হিত দেখিয়া সুরকি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গা ঝাড়া দিল, কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে একবার মুন্সীর অস্ফুট মিও শব্দ ধ্বনিত হইল, কিন্তু নীলমণির কোন পরিবর্ত্তন হইল না সে আগের মতোই চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল।

নীলমণি মনে বড় আঘাত পাইয়াছে, আঘাত এবং অপমান। সে ভাবে—তুমি কে বাপু, উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলে। আর আসিলেই যদি আমাদের সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকো। সে ভাবে—তুমি আসিয়াই সকলের উপরে খড়্গহস্ত হইয়াছ, আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিয়াছ, ব্যাপার কি। তাও না হয় সহ্য হয়, কিন্তু গায়ে পড়িয়া অপমানটা কেন? আমরা তো কোন ক্ষতি করি নাই। তাহার মনে পড়ে সেদিন মুরলীর মাথায় হলদে পাগড়িটা। তখনি কেমন খটকা বাধিয়াছিল, এখন হাতে হাতে প্রমাণ হইয়া গেল সে আশঙ্কা অমূলক নয়। কিন্তু আঘাতটাও না হয় সহ্য হয়, খাদ্যাভাবও তেমন গুরুতর নয়, বনে কি সব দিন খাদ্য মেলে? কিন্তু অপমান যে অসহ্য। তার উপরে কেবল তাহাকে যদি অপমান হইত তাহাও না হয় মুখ বুজিয়া সহ্য করিত, বনের

পশু কথা বলিতে পারে না তো। কিন্তু প্রভুকে অবধি অপমান। এমন প্রভু। এমন সদয়, এমন বৎসল। তাহার আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না। নীলমণিকে দেখিলেই ইন্দু দূর ছাই করে, বলে, বনের জানোয়ারটাকে রাজপুত্রের আদরে রাখা হইয়াছে; বলে, দাও বেটাকে তাড়াইয়া, বনে যাক্, দেখি কেমন আরামে থাকে। সে ভাবে—তুমি তো বাপু বন দেখো নাই। তাই ভাবো সেখানে বড় দুঃখ। হায় একবার যদি দেখিতে, আহা একবার যদি দেখাইতে পারিতাম, তবে বুঝিতে নীলমণির বন ইন্দুর বাড়ীর চেয়ে অনেক আরামদায়ক, অনেক সুন্দর। সেই তো স্বর্গ। তার তুলনায় তোমার এ বাড়ী....আগে একরকম ছিল এখন নরক, ভাগাড়।

শৈশবের সেই অরণ্য তাহার মনে পড়ে। এত ক্ষীণ, এত অস্পষ্ট, সে কি স্মৃতি না স্বপ্ন! স্মৃতি হোক স্বপ্নই হোক বড় মনোরম। সে কি অগাধ শান্তি, সে কি অবাধ অবকাশ। কেবল গাছের পাতা খসার টুপটাপ, কেবল দূর মাঠে গোরুর গলার টুং টুং, কেবল পাখীর ডাকাডাকি, কেবল দমকে দমকে বাতাসের সর সর মর মর, আর দিনরাত্রিব্যাপী ঝরণার অবিরাম কলকল, গলগল, ছলছল। তাহার মনে পড়ে পাহাড়ের গায়ে শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে শুঁড়ি পথ। মায়ের পিছু পিছু সে উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পা হড়কিয়া যায়, শব্দ শুনিয়া মা ফিরিয়া তাকায়, সাহায্য করিব নাকি? সে কি নাবালক? তখনি আবার হাঁটিতে সুরু করে। মা ভাবে—সাবাস! ওর মা বাপের মতোই হইবে দেখিতেছি। আবার দুইজনে চলে। পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি গুহা। ছোট একটা নালা পার হইয়া দুই জনে ঢোকে। সে অবশ্য মায়ের মত এক লাফে নালা পার হইতে পারে না, পাথরে পাথরে পা রাখিয়া

পার হয়, কিন্তু আর দুচার দিন পরে সে-ও একলাফে পার হইবে, পা-গুলা আর একটু শক্ত হোক না, তখন মা আবার ভাবিবে বাপের মতোই হইয়াছে। বাপকে তাহার মনে পড়ে না। তবে অবশ্য তাহার মতোই হইবে, কেবল আরও খানিকটা বড়, আরও খানিকটা শক্ত সমর্থ। গুহায় আসিয়া মা বসে, সে কোলের কাছে শুইয়া পড়ে, নখ দিয়া মা তাহার কচি কচি লোমগুলা আঁচড়াইয়া দেয়।

দিনের বেলায় তাহারা উপত্যকায় নামিয়া আসে, সেখানে কচি ঘাসের সমতল মাঠ, মাঝখানে ফাঁকা। মায়ের দেখাদেখি সে-ও উইয়ের ঢিবি সন্ধান করিতে শিখিয়াছে। থাবা দিয়া মাটি ভাঙিতেই সারি সারি সাদা সাদা ছোট ছোট পোকা, খুঁটিয়া খাইতে কোন কষ্ট নাই। ওদের অবশ্য মা নাই, থাকিলে খাইতে তাহার কষ্ট হইত। তারপরে মা গাছে উঠিয়া কচি কচি সবুজ সবুজ ডাল ভাঙিয়া দেয়, সে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পাতাগুলি খায়, কেমন মিষ্টি ; মাঝে মাঝে সে গাছে উঠিতে চেষ্টা করে, পারে না, কেবল গাছের গুঁড়িতে আঁচড় কামড় দেওয়াই সার হয়। মা উপর হইতে দেখিয়া সস্নেহে হাসে। ভালুকের আবার হাসি! হাঁ গো হাঁ, ভালুকেও তোমাদের মতো হাসে, কাঁদে, ভয় পায়, ভালবাসে। তবে তোমাদের মতো, তোমার মতো, ইন্দুর মতো এমন বদমেজাজী নয়। আচ্ছা, তাহার প্রভু এমন স্নেহবান্ হইল কিরূপে, এমন তো মানুষের স্বভাব নয়। নিশ্চয় সে আর জন্মে ভালুক ছিল, খুব সম্ভব তাহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বাপ ছিল, নইলে তাহাকে এত ভাল-বাসিতে যাইবে কেন? কখনো ভাবে আর এই নূতন লোকটিও, ঐ যে চারপায়ার উপরে চোখ বুজিয়া বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এই লোকটিও মন্দ নয়, ইতিমধ্যেই তাহাকে খুব ভালবাসিতে

সুরু করিয়াছে। সে কেমন করিয়া বুঝিল? এসব বিষয় জন্তু-জানোয়ার আর শিশুরা ঠিক বুঝিতে পারে, ভুল করে না। আহা এই লোকটি যদি পরজন্মে ভালুক হইয়া জন্মে তবে বেশ হয়, দুই জনে খুব খেলা করে। তখন ও-তো ছোট থাকিবে, এক সময়ে সে যেমন ছিল, তাহার মা তখন যেমন তাহাকে সব শিখাইত, নীলমণিও তেমনি তাহাকে শিখাইবে, উইয়ের ঢিবি সন্ধান করিতে, গাছে উঠিতে, শিয়াল তাড়া করিতে, আর হঠাৎ শিকারী আসিয়া পড়িলে গুহার মধ্যে লুকাইতে। তাহার ছোট ভাইটিকে কখনো সে শিকারীর হাতে পড়িতে দিবে না। তারা গুলি করিয়া মারে, নতুবা ধরিয়া পোষ মানাইয়া গাঁয়ে গাঁয়ে নাচাইয়া পয়সা রোজগার করে। সে ভাবে, আরে ছিঃ ছিঃ একি নাচ! আসল ভালুকের নাচ সে অনেক-বার দেখিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট দুটি পায়ে ভর দিয়া, সমুখের পা দুটিতে ভার রক্ষা করিয়া নিজেও না কতবার সে নাচিয়াছে, পায়ের নীচে শুকনা পাতা তালে তালে বাজিয়াছে ঝম ঝম, ঝম ঝম। তখন গাছে গাছে শাল ফুল, ডালে ডালে মহুয়া, মাঠে মাঠে পলাশ আর শিমুল। শিমুল আর পলাশ। বনে কি ফুলের অন্ত আছে? গলগলি, কুসুম, শিউলি, কদম, জারুল কত চাই।

হাঃ হাঃ হাঃ। মনে পড়িলে এখনো তার হাসি পায়। মা একদিন আচ্ছা করিয়া তাহাকে মহুয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিল, সে-ই তার প্রথম মহুয়া খাওয়া। কিছুক্ষণ পরে সে আর উঠিতে পারে না, পা টলে, মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার। এ কি হইল! অবশেষে উঠিবার আশা ছাড়িয়া সে পড়িয়া রহিল। কিন্তু কই, কষ্ট হইল না তো! বরঞ্চ সে কেমন এক অদ্ভুত সুখের ভাব। ঘুমে, স্বপ্নে, আলস্যে এক অদ্ভুত তন্দ্রা। হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা জানলা

যেন খুলিয়া গেল। চারিদিক কি সুন্দর, কি সুখময়। কিন্তু কিসের একটা অভাব হঠাৎ যেন সে অনুভব করিল, যেন এত সুখেও সম্পূর্ণ সুখ নাই, এত আনন্দও সম্পূর্ণ সফল নয়, যেন এত সৌন্দর্য্যেও সব ফাঁকা। তাহার মনে হইল সে যেন বড় একা! না, না, মা বাপ সে ফাঁক ভরাইতে পারিবে না। তবে কি, তবে কে?

সেদিনের পরে সুযোগ পাইলেই সে মহুয়া খাইত, গাছে উঠিতে পারিত না, তলায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইত, আর বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত। বড় সুখ কিন্তু বড় একা। কিসের অভাব, কাহার অভাব? কি না কে? কিছুই বুঝিতে পারিত না। সে ছিল তার গৃহ, তার অরণ্য, তার স্বর্গ! আহা আবার সেখানে ফিরিয়া যাওয়া যায় না? আবার মহুয়া খাইবে, আবার নেশা হইবে, আবার অভাব অনুভব করিবে। কিন্তু এবারে সে বুঝিয়াছে কি অভাব। কি নয়, কে। সেই অভাবের তাড়নাতেই তাহার প্রভু ঘরে ইন্দুকে আনিয়াছে।

ইন্দুর কথা মনে পড়িবামাত্র তাহার চটকা ভাঙিয়া যায়, উঠিয়া বসে, দেখিতে পায় খাবার হাতে করিয়া ইন্দু চারপায়ার দিকে চলিয়াছে।

জানোয়ারটা কেমন হ্যাংলার মতো খাবারের দিকে তাকিয়ে আছে! তোর জন্যেই বটে। দাঁড়া দিচ্ছি।

এই বলিয়া সে সঞ্জীবের হাতে খাবার দিয়া একখানা চেলা কাঠ তুলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়।

আহা করো কি, করো কি, বলে সঞ্জীব।

আরে ইন্দু, কেষ্টর জীব মারিসনে, বলিয়া মুরলী কাঠখানা কাড়িয়া লয়। নিষ্ফল ক্রোধে ইন্দু গজরাইতে থাকে।

১১

মেয়েরা ধারাগিরি হইতে ফিরিবার দিন দুই পরে ভবানী দেবী একদিন স্বামীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, ছায়া আর কতদিন এখানে ব'সে থাকবে? ওকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দাও।

তারিণীবাবু বায়ুগ্রস্ত লোক, বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারেন না, বসিলেও তখনি উঠিয়া ছটফট করিয়া পায়চারী করিতে থাকেন। স্ত্রীর আহ্বানে তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, সে কি, লোকে কল্‌কাতা ছেড়ে পালিয়ে আসছে, এর মধ্যে ওকে কল্‌কাতা পাঠাবো, লোকে বলবে কি?

আর এখানে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে ধিঙ্গিপনা করলেই লোকে খুব সুখ্যাতি করবে, না?

ছায়ার আচরণে কোন অশিষ্টতা তিনি লক্ষ্য করেন নাই, তাই সেদিক দিয়া না গিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু কলেজ যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তা হ'লে বহরমপুরে পাঠিয়ে দাও।

বহরমপুরে ছায়ার মামার বাড়ী।

সেখানে গিয়ে কি করবে?

এখানে থেকেই বা কি করছে?

ওখানে গেলেই কি পড়াশুনার সুবিধে হবে?

এখানকার চেয়ে বেশি হবে, নিতাই আছে, সে একটা বিদ্বান লোক, আরও পাঁচটা লেখাপড়া জানা লোক আছে।

নিতাই ছায়ার সেই মাতুল, যে সদ্যজাত ভাগ্নীর কয়াধূ নাম রাখিয়াছিল। অধুনা সে জজের পেস্কার।

তারিণী বুঝিলেন যে পড়াশোনাটা উপলক্ষ্য মাত্র, আরও কি একটা উদ্দেশ্য আছে। জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার অভিরুচি হইল না, নানা তিক্ত প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িবে, হয়তো ভবানীর রোগশয্যার ধুয়া "তে রাত্তিরও পোয়াবে না"—শুনিতে হইবে; তাই বলিলেন, দেখি কি করতে পারি।

না, না, অনেক দেখেছ, আর দেখাদেখি নয়, আজকালের মধ্যেই পাঠিয়ে দাও।

তাই হবে বলিয়া তারিণী প্রস্থান করিলেন।

ভবানী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। একা শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আসল কথা তো প্রকাশ করা যায় না। স্বামীর কাছেও নয়, অন্ততঃ এমন সংসারজ্ঞানশূন্য স্বামীর কাছে নয়। ভবানী আশা করিয়া ছিলেন একরূপ, অবশ্য সঙ্গে যে একটুখানি আশঙ্কার কাঁটা না ছিল এমন নয়। আর তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কাঁটাই তাঁহার কপালে বিঁধিল। তাঁহার আশা ছিল সঞ্জীব কায়ার প্রতি অনুরক্ত হইবে। আর যথাসময়ে তিনি তাহাদের দুই হাত এক করিতে পারিবেন। কিন্তু পুরুষের মুগ্ধ চোখ ছায়ার ফর্সা রঙ দেখিয়া ভুলিল—আশঙ্কা ঐ টুকু। কায়া ও সঞ্জীব অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাইবে ভাবিয়া তিনি খুশী হইয়া ধারাগিরি যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক উল্টা ফল ফলিল। ধারাগিরি হইতে ফিরিবার পরে কায়ার মুখ দেখিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে খচ্ করিয়া উঠিল—একি যাইবার

আগে ও ফিরিবার পরে কায়ার মুখের এ কি তফাৎ! সে যেন সর্ব্বদা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে, অত্যন্ত প্রাণপণে উদ্গত চোখের জল সামলাইয়া রাখিয়াছে। আর ছায়ায় মুখের পরিবর্ত্তনও নারীর চোখ এড়াইল না। সূর্য্যোদয়ের নূতন আভাকে মেঘচাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেই কি ঢাকা থাকে? কি একটা সুখময় অভিজ্ঞতা যেন সে প্রাণপণে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বনাশ! এই জন্যেই কি তাঁহার এত আকিঞ্চন, এত প্রচেষ্টা, এত কৌশল ও ষড়যন্ত্র। ছায়া ও কায়া মুখে কেহ কিছু বলে না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারা যায়, দুইজন দুই ভিন্ন কক্ষ পথে চলিতে সুরু করিয়াছে, এতদিন তাহারা এক কক্ষপথের যাত্রী ছিল।

তিনি দুইজনকে কাছে বসাইয়া শুধাইলেন, বল্ ওখানে কি দেখলি?

কেহ উত্তর করে না।

বাঃ রে, তোদের পাঠালাম, তোরা দেখে এসে আমাকে গল্প বল্‌বি, আমি তো নড়তে পারিনে।

ছায়া বলিল, খুব সুন্দর মা।

কায়া বলিয়া উঠিল, সুন্দর না ছাই, ওর চেয়ে বনকাঠির পাহাড় অনেক সুন্দর।

এই বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

ভবানী ভাবিলেন ভালই হইল, ছায়াকে একা পাওয়া গিয়াছে, দেখা যাক্ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

তোরা কখন্ গিয়ে পৌঁছলি?

এই ধরো ন'টার মধ্যেই।

কোথায় গেলি?

ঝরণার কাছে।

রান্না হ'ল কোথায় ?

ওখানেই তো সবাই করে, মা।

কি কি রান্না হ'ল রে ?

খিচুড়ি, মাংস আর আলু ভাজা।

তুই রাঁধলি বুঝি ?

তুমি তো জানো মা, আমি ও সব পারি নে। ও বাড়ীর কাকিমা আর কায়া রাঁধল।

সঞ্জীববাবু কি করলেন ?

তিনি আর কি করবেন ? বোধ করি মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালেন।

সঞ্জীবের গতিবিধি সম্বন্ধে আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু আর একটা কথাও বাহির করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, তবে বোধকরি সন্দেহ অমূলক ; তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

ছায়া উঠিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন তবু একবার কায়াকে বাজাইয়া দেখিতে হইবে, দু'দিকের কথা না শুনিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে না। তারপরে এক সময়ে কায়াকে একাকী পাইয়া ভবানী বলিলেন, একটু কাছে এসে ব'স মা।

হাতের কাজটুকু সেরে আসি।

না, না, কাজ পরে হবে, এখন একবার ব'স দেখি।

ধারাগিরি হইতে ফিরিবার পরে কায়া কাছে ঘেঁষে নাই তাঁহার মনে পড়িল।

মায়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সে তক্তপোষের এক প্রান্তে বসিল।

হাঁ রে, ধারাগিরি আমি সেই দেখেছিলাম বছর দশেক আগে, এখনো কি তেমনি আছে নাকি?

পাহাড়ের কি আবার বদল হয় নাকি?

বন জঙ্গল অনেক কেটে ফেলেছে শুনেছিলাম কিনা।

যেমন কেটেছে তেমনি আবার নূতন হ'য়েছে।

বাঘ ভালুক?

চোখে তো পড়ল না, তবে এক আধটা বেরুলে মন্দ হতো না।

কেন রে?

এক আধটা মানুষ জখম করলে ওখানে বনভোজন করা বন্ধ হ'তো।

আর সঞ্জীববাবু বুঝি মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালেন, বিদেশী মানুষ বাঘের সমুখে যদি পড়তেন!

কায়া শিহরিয়া উঠিল, সে কি মা, তাই ভেবে কি বলেছি?

না, না, তা বলবি কেন, তোর সঙ্গে বুঝি অনেক গল্প করলেন?

কায়া উত্তর করিল না।

কিরে চুপ ক'রে কেন? মায়ের কাছে লজ্জা কি!

কায়ার প্রাণপণ সংযম ব্যর্থ হইল, চোখে ধারা নামিল। সে ছুটিয়া পাশের ঘরে প্রস্থান করিল।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি লজ্জা! ভাবিতে ভাবিতে কায়া বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িল। কিন্তু এ কি, চোখের জল যে আর থামে না। সে ভাবে এত জল কোথায় ছিল! প্রশ্নটা অন্য আকারে তাহার মনে দেখা দেয়—ধারাগিরির ধারাই বা কোথায় থাকে? কিন্তু সব জিজ্ঞাসা ছাপাইয়া ওঠে লজ্জার ধিক্কার। এ কি লজ্জা, এ যে মরিলেও যাইবার নয়।

ভবানী বুঝিলেন ঘটনার সূত্র এখন তাঁহাকেই ধরিতে হইবে, মেয়েদের হাতে আর ছাড়িয়া দেওয়া নয়। তিনি স্থির করিলেন সর্ব্বাগ্রে এখন কর্ত্তব্য ছায়াকে এখান হইতে সরাইয়া দেওয়া।

পেটেণ্ট ঔষধও নিষ্ফল হইতে পাবে কিন্তু ভবানী দেবীর আদেশ নিষ্ফল হইবাব নয়। ছায়াকে দিন দুইয়ের মধ্যে নরসিংপুর ত্যাগ করিতে হইল।

যাইবার সময়ে সে মাকে বলিল, মা, এখানকার মাঠের মধ্যে আমার হাঁপ ধরে উঠ্‌ছিল, এবারে বাঁচলাম।

কায়া ছায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, দিদি তুমি যেওনা, পড়াশোনা এখন থাক্।

সে কি রে, পবীক্ষা তো দিতেই হবে।

কাযা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দিদি আমি আর কোন দোষ করবোনা, তুমি থাকো।

সেকি, তুই কি আবার কি দোষ করলি! কায়া তুই কি চির-কালই বোকা হয়ে থাকবি!

কায়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

সেই পুরাতন প্রশ্নটা নূতন ভাবে তাহার মনে দেখা দিল, এ কেমন জলের ধাবা?

অশ্রুর প্রকৃতি যেমন বিচিত্র তেমনি দুর্ব্বোধ্য।

ছায়া যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, কায়া, বাবার দিকে লক্ষ্য রাখিস।

সে জানিত ঐ ব্যক্তিটি সংসারের উপেক্ষিত।

সারদাবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া যখন তাহার সাইকেল রিক্স চলিতেছিল, পাছে কাহাকেও চোখে পড়ে তাই সে মুখ ঘুরাইয়া

লইল। কিন্তু ওকি! অভাবিত দিক হইতে বাণ আসিয়া হরিণীকে আহত করিল। মাঠের মধ্যে ও কাহার বাদামী চাদরের আভা?

এই রিক্সওয়ালা, জোরে চালাও।

রিক্স ছুটিয়া চলিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল সেই বাদামী চাদরের স্মৃতি। সে স্মৃতি তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, যেমন পথিকের সঙ্গ ছাড়ে না দূর আকাশের সদ্যোত্থিত চন্দ্রমা।

১২

ছায়া চলিয়া গিয়াছে, সাক্ষাৎ না করিয়া, সম্ভাষণ না করিয়া, ছায়া চলিয়া গিয়াছে—এই কথা ক'টি সঞ্জীবের বুকের মধ্যে সারাদিন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। সে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যাহার জন্য এত বড় দণ্ড! তাহার মনে হইতে লাগিল সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। কখনো মনে হইল কেনই বা বিশেষ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইবে, এই কটা দিন বইতো নয়। এই কটা দিনে এমন কি ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে! আবার মনে হইল ভদ্রতাও আছে তো! সে ভাবিল ছায়ার চোখে সে যদি অকিঞ্চিৎকর হয় তাহার চোখেই বা ছায়া কেন অকিঞ্চিৎকর না হইবে! না, সে আর ছায়ার কথা ভাবিবে না। এই কথা মনে হইতেই সে সুখ পাইল, কিন্তু শান্তি পাইল কি? কিছু মাত্র নয়। হাতখানা যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্যথার স্থানে পড়ে, তেমনি

ঘুরিয়া ফিরিয়া ছায়ার কথা মনে হইতে লাগিল। অনুপস্থিত ছায়া ক্রমেই অধিকতর প্রভাবে তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিল।

সঞ্জীব আপন মনে ধীরপদে শহরের প্রান্তে এক শালের বনের কাছে আসিয়া একখণ্ড পাথরে ঠেসান দিয়া বসিয়া প'ড়িল।

কাল রাতে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ছায়া ও সে, দুইজনে একটা পাহাড়ের উপরে যেন বসিয়াছিল, এমন সময়ে ঝোপের মধ্যে হইতে এক ভালুক বাহির হইল। ভালুক দেখিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ছায়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। আঃ, সে কি সুখস্পর্শ, মনে করিতে এখনো তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে শুধাইল, কি? ছায়া বলিল, ভালুক! সে আগে ভালুকটা দেখিতে পায় নাই। এখন ছায়ার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাকাইয়া দেখিল, ভালুক কই, কায়া যে! কায়া যেন কাঁদিতেছে।

ছায়া বলিল, এমন ক'রে ভয় দেখাস কেন?

কায়া বলিল—ভয় কোথায় দেখালাম। আমিই তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সঞ্জীব বলিল, নাও, কারো আর ভয় পেয়ে কাজ নেই, এখন বাড়ী চলো।

তাহারা নামিতে লাগিল, এমন সময়ে পা হড়কাইয়া ছায়া নীচে পড়িয়া গেল। সঞ্জীব তাহাকে ধরিতে যাইবে হঠাৎ কে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, সে বলিল, কায়া ধরো কেন? তাকাইয়া দেখিল কায়া নয়, সেই ভালুকটা।

তারপরে কি হইল মনে নাই। ঘুম ভাঙিয়া সে খুব এক চোট হাসিল, ভাবিল সকালবেলাতেই ছায়াকে স্বপ্নের ঘটনা বলিবে ছায়ার খুব মজা লাগিবে।

সকাল বেলাতে সে ছায়াদের বাড়ীতে যাইতেছিল এমন সময়ে পাঁপড়ির সঙ্গে দেখা। সে বলিল, দাদাবাবু, তোমাদের ইস্কুল কলেজ কি খুলে গেল নাকি?

কেন রে?

কাল যে ছায়া দিদিমণি বড় নাচতে নাচতে কল্‌কাতা চলে গেল।

কে গেল?

ছায়া দিদিমণি।

কি বলিস, যত সব বাজে কথা।

নাও, আমি আর ছায়া দিদিমণিকে চিনি নে!

কোথায় গেল?

কল্‌কাতা।

তুই নিজে দেখেছিস?

আমার চোখ দিয়ে তবে আর কে দেখবে? এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল, আমাকে দেখে বল্‌ল, পাঁপড়ি কল্‌কাতা চল্‌লাম, সব বলিস রে।

কখন্ গেল?

বিকালের গাড়ীতে।

এতক্ষণ বলিস নি কেন?

কেন বল্‌বো না? মাকে বলেছি, কর্ত্তাবাবুকে বলেছি, সন্তুকে বলেছি, চাকরবাকরদের বলেছি, ভিখারী হরি খোঁড়াকে বলেছি।

আমাকে বলিসনি কেন?

তোমাকে তো বল্‌তে বলেনি।

ওদের কি বল্‌তে বলেছিল?

বলেছিল বই কি। বলেছিল কাকিমা, কাকাবাবুদের বলিস, সন্তুদের বলিস। কই তোমার নাম তো করলো না। হরি খোঁড়াকে দেখ্‌লেই ভিক্ষে দিত, তাই তাকেও বল্‌লাম।

তোদের ছেড়ে যেতে নিশ্চয়ই ছায়ার খুব কষ্ট হচ্ছিল?

কিছু না, কিছু না।

কেমন ক'রে বুঝ্‌লি?

হাসি-মুখ দেখলে কি বুঝ্‌তে পারা যায় না?

তা বটে! আর কিছু বল্‌ল?

রিক্সঅলাকে বল্‌ল, শীগগীর চল্, ট্রেন ধরতে হবে।

হঠাৎ চলে গেল কেন, কিছু জানিস?

এতে জানবার আর কি আছে, কলেজ খুলে গেল তাই গিয়েছে।

কলেজ তো খোলেনি।

তবে বোধ হয় এখানে ভালো লাগছিল না।

সঞ্জীবের চোখে এক মুহূর্তে চরাচর অন্ধকার হইয়া গেল।

সারাটা সকাল সে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। দুপুরবেলা ক্লান্ত হইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙিতেই কি একটা শূন্যতা বোধ হইল, মনে পড়িল ছায়া নাই। একখানা গায়ের কাপড় লইয়া তাড়াতাড়ি মাঠের দিকে চলিল, সে একটু একাকী থাকিতে চায়।

পাথর ঠেসান দিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া রহিল, ছায়াকে ভুলিবে। যতই সে প্রাণপণে ছায়াকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করে, ততই ছায়া যেন অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। তাহার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাহনি, প্রত্যেকটি হাসির রেখা, তাহার

গতির ছন্দ, শাড়ীর রঙ, জামার ভঙ্গী, গলার হার, কানের দুল, সপ্তরথীর মতো তাহাকে ঘিরিয়া ধরে, পরিত্রাণের উপায় নাই, পলায়নের পথ নাই। উপস্থিত ছায়াকে অনেকবার সে উপেক্ষা করিয়াছে, অনুপস্থিত ছায়া আজ বিশ্বরূপ ধরিয়া দণ্ডায়মান। কাহাকে ভুলিবে সে? তারপরে ভাবিল ভুলিব কেন? ছায়াকে মনে করিলে সুখ যদি পাই, সে সুখ ছাড়িব কেন? কিন্তু একি! যখন সে সচেতন প্রত্যক্ষভাবে ছায়াকে মনে করিতে চেষ্টা করিল সব কেমন অস্পষ্ট হইয়া গেল, সরোবরের জল তীর হইতে কেমন স্বচ্ছ, নামিবামাত্র যেমন ঘোলাটে হইয়া যায়।

হঠাৎ কোকিলের ডাক কানে আসিতে সে চমকিয়া চোখ মেলিল, মাঘ মাসে কোকিল ডাকে কোথায়? কোকিলই বটে, তাহার চোখে পড়িল পশ্চিমের পাহাড়টার পিছনে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আকাশের রঙ কমলায় বেগনিতে পাটলে মেশানো। ঐ তপ্ত উজ্জ্বল রঙের জাদুতে পাহাড়টা যেন অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে, আর কেমন স্পষ্ট নিরেট বোধ হইতেছে, দুপুরবেলার খর রৌদ্রে ওটাকে সুদূর-পরাহত আকাশের অংশ বলিয়া মনে হয়। সে দেখিল পাহাড়ের উপরকার আকাশ-রেখায় অবস্থিত বনস্পতি-গুলি কেমন প্রত্যক্ষ, ডালপালাগুলি গনিয়া লওয়া যায়। দূরের পাহাড় সবুজে নীলে কালোতে মেশা, আর দু'চার দণ্ডের মধ্যেই আকাশে বনে পাহাড়ে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই অপরূপ সৌন্দর্য্যে আজ আর তাহার মন জাগ্রত হইয়া উঠিল না, অথচ কতদিন সন্ধ্যাবেলার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার মন পদ্মপাতায় শিশির ফোঁটার মতো আনন্দে সন্তঃপাতী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে পড়িল সেদিন ছায়া সঙ্গে

ছিল, আজ একা, সেদিন চার চক্ষে দেখিয়াছিল, আজ কেবল দুই চক্ষে দেখা ; সেদিন সৌন্দর্য্য ছিল আজ কেবল রেখা, সেদিন আনন্দ ছিল, আজ শুধুই রঙ। সঞ্জীব কেবল কবি না হইয়া যদি দার্শনিকও হইত তবে বুঝিত যে আড়াআড়ি সূতা না চলিলে কাপড় বোনা যায় না। মানুষে ও প্রকৃতিতে মিলিয়া পূর্ণতা। সেদিন ছায়াতে ও প্রকৃতিতে মিলিয়া ছিল তাই সব ছিল সুন্দর; আজ ছায়া গিয়াছে তাই প্রকৃতি আর সুন্দর লাগিতেছে না ; তাই প্রকৃতি আজ জল মাটি আর পাথরের স্তূপ, কেবল ধূম জ্যোতি সলিল ও মরুৎ।

হুজুর সেলাম।

একি, মুরলী যে !

সঞ্জীব তন্ময় হইয়াছিল, তাহাকে আগে দেখিতে পায় নাই।

একা যে, নীলমণি কই ?

হুজুর, তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি।

নীলমণি আবার কোথায় গেল ?

কি জানি হুজুর।

সে তো পোষমানা ভালুক, যাবার তো নয় !

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে বলিল, হুজুর আপনি ঠিকই বলেছিলেন ।

কি বলেছিলাম ?

বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন।

কেন বউতো মন্দ হয়নি—

এবারে সে তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, মন্দ হয়নি ! ভালোটা কি দেখলেন ! ঐ বেটির জন্যেই আমার মুন্সী গেল, সুরকি গেল, আজ সকাল থেকে আবার নীলমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে না কি ?

মারতে হবে কেন, ও সব বনের প্রাণী মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। না, না, হাসবেন না হুজুর, আমি অনেকদিন ওদের নিয়ে ঘর করছি আমি জানি। ও বুঝতে পেরেছে বাড়ীর গিন্নি ওকে দেখতে পারে না, তাই অপমানে যে দিকে চোখ যায় চলে গিয়েছে।

কতদূর খুঁজে এলে ?

এদিকে গঙ্গানীর হাট পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম, কেউ দেখেনি। বোধ করি নদীর ওপারে চলে গিয়েছে, কাল ওদিকে যাবো।

ভালুক গেলে তোমার চলবে কি ক'রে ?

সে কথা বোঝে কে বাবু!

তোমার বউ কি বলে ?

বলে কারখানায় চলো, জানোয়ারের জন্য আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। আচ্ছা বলুন বাবু, একি আমার মায়া কান্না!

এই বলিয়া সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, বলিল, দশ বছর ওকে নিয়ে ঘর করছি, এতটুকু থেকে মানুষ করছি, মায়া হবে না? ও আমাকে অন্ন জুগিয়েছে, মায়া হবে না? ও বেটি আজ উড়ে এসে ব'সে কি বুঝবে যে বলে মায়াকান্না।

সঞ্জীব তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, নীলমণি তোমার মায়া এড়াতে পারবেনা নিশ্চয়ই আজ রাতে ফিরে আসবে। হয় তো বা এতক্ষণ ফিরেই এসেছে।

আপনার কথা সত্য হোক বাবু, রঙ্কিনী মা আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ করুন।

এই বলিয়া সে বাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহার মুগ্ধ আশা হয় তো বা নীলমণি এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে, বউবেটি না জানি আবার কি অত্যাচার সুরু করিয়াছে তাহার উপরে।

দুঃখের আর এক মূর্ত্তি সঞ্জীব আজ দেখিল ঐ মুরলীর শোকে। দুঃখের বিচিত্র প্রকৃতি।

আকাশ-ভরা অন্ধকারের তলায় সে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। টাটার লোহার কারখানার চুল্লির দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে পশ্চিম দিগন্তকে দীপ্যমান করিয়া তুলিতে লাগিল আর তাহার মনের মধ্যেও একটা জ্যোতিঃকলাপ রহিয়া রহিয়া প্রভা বিস্তার করিতে থাকিল, সৌন্দর্য্যের, আনন্দের, প্রেমের।

১৩

ভবানী দেবীর দিন আর কাটে না, সারা দিন একা একা শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করেন, কোন কিনারা পান না; সারা রাত বিনিদ্র কাটান; মাঝে মাঝে তারিণীবাবু শুধান, কি ঘুমুলে নাকি? তিনি কোন উত্তর দেন না, চুপ করিয়া শুইয়া এপাশ ওপাশ করেন। তিনি ভাবেন, শেষে কি ভালো করিতে গিয়া মন্দ করিলেন! না হয় সঞ্জীব ছায়াকেই বিবাহ করিত, এখন তাঁহার সন্দেহমাত্র নাই যে ছায়াতে সে অনুরক্ত হইয়াছিল। আবার ভাবেন ছায়া সুশ্রী শিক্ষিত, সে কেন ইস্কুল মাষ্টারের হাতে পড়িবে। তাঁহার ধারণা প্রজাপতির বিধানে সংসারের যাবতীয় কালো মেয়ে ইস্কুল মাষ্টারের জন্য সংরক্ষিত! যাহার রূপা নাই তাহার আবার রূপে আগ্রহ

কেন? আবার কখনো ভাবেন কায়া তো দেখিতে মন্দ নয়, রঙটা শ্যামবর্ণ এই মাত্র! তাঁহার তো শামলা রঙটাই ভালো লাগে। কিন্তু পুরুষের চোখ যে অন্ধ, গৌর বর্ণ থাকিতে শামলার দিকে পড়িতে চায় না। সেই আশঙ্কাতেই তিনি ছায়াকে সরাইয়া দিলেন, কিন্তু তখন কি তিনি জানিতেন সঞ্জীব সত্যই ছায়াকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। নতুবা ছায়া যাইবার পরে এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করিল কেন? আবার ছায়াও যদি তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে? হয়তো তাহাদের মধ্যে চিঠিপত্র চলিতেছে। একবার পাঁপড়িকে ডাকিয়া কথায় কথায় শুধাইতে হইবে তিনি স্থির করেন।

কায়া মায়ের কাছে এখন আর বড় ঘেঁষে না। সেবার নিত্য কর্ম্মটুকু অবশ্য করে, কিন্তু আগের মতো কাছে বসিয়া আর গল্প করে না, সর্ব্বদা বিমর্ষ মুখে থাকে। দুস্তর সমুদ্রের নাবিক যেমন দিগন্তের দিকে তাকাইয়া আশার চিহ্ন সন্ধান করে, ভবানী তেমনি করিয়া কায়ার মুখের দিকে তাকান, আশার রেখা দেখিতে পান না। অনেক দিন পরে কায়া একবার সারদাবাবুর বাসায় গিয়াছিল, আগে ঘন ঘন যাইত। মেয়ে ফিরিলে মা শুধাইলেন— কিরে ওরা সব কেমন আছে?

ভালো আছে মা।

তোর কাকিমা কি করছেন দেখলি?

মাছ কিনছিলেন।

সারদাবাবু?

খবরের কাগজ পড়ছেন।

সন্তু?

জন দুই ছেলে জুটিয়ে নিয়ে ডাংগুলি খেলা করছে।

পাঁপড়ি ?

ওদের খেলা দেখছে !

এবারে মা একটু চুপ করিয়া থাকেন, তারপরে শুধান নিতান্ত অবান্তর ভাবে, হ্যাঁরে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা হল ?

তিনি তো বাড়ীতে নেই।

কোথায় গিয়েছেন ?

তা কে শুধোতে গিয়েছে, বলিয়া সে উঠিয়া পড়ে।

পাশের ঘরে গিয়া কায়া ভাবে, ছিঃ ছিঃ, মা কি ভাবিয়াছিলেন আমি সঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা করিতে ও-বাড়ী গিয়াছিলাম! সে সঙ্কল্প করে আর ও-বাড়ী যাইবে না। সে মায়ের মনোভাব বুঝিতে পারে না, ভাবে মা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কেন? সে বুঝিতে পারে যে ছায়া তাহার উপরে রাগ করিয়াছে, নতুবা পৌঁছাসংবাদ দিবার পরে আর চিঠি লেখে নাই কেন, আগে হইলে ইতিমধ্যে ৫।৭ খানা চিঠি আসিত। কিন্তু কেন? ভবানীদেবী ভাবেন ছায়াটা নিতান্ত হ্যাংলা, কলেজে পড়িয়াই তাহার এই দুর্গতি। আর সঞ্জীবটা নেমকহারাম, কিন্তু ঠিক কি তাহার দোষ নির্ণয় করিতে পারেন না। ওদিকে সঞ্জীব একাকী মাঠে মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে ভাবে ছায়া নিতান্ত হৃদয়হীন, দেখা না করিয়া সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেল। অনিবার্য্য কোন কারণে যাইবার সময়ে যদি দেখা করা সম্ভব না হইয়া থাকে পরে একখানা চিঠি লিখিতেও তো পারিত। সঞ্জীব স্থির করে অবশ্যই সে হৃদয়হীন। এদিকে ছায়ার চোখের জল তো কেহ দেখিতে পাইল না। কায়ার মতো তাহার চোখে জল ঝরে না সত্য, কিন্তু বাষ্পে চোখ দুইটি আচ্ছন্ন হইয়া ওঠে। অশ্রুবাষ্পাকুল শরৎকালে

সন্ধ্যা যেমন মেঘের আড়াল টানিয়া চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে ছায়া চলিয়া গেল, দেখিয়াও কেহ বুঝিল না। সংসারে চোখের জলই মানুষের চোখে পড়ে, অশ্রুবাষ্পের হিসাব কে রাখে। কেন এমন হইল, কাহার দোষে এমন হইল ভাবিয়া সকলে অন্ধভাবে হাতড়াইয়া মরিতেছে। কানামাছি খেলায় চোর ধরাই যদি উদ্দেশ্য হইত তবে চোখ না বাঁধিলেই তো সুবিধা ছিল, ঐ চোখ বাঁধা হয় বলিয়াই তো খেলার রস জমিয়া ওঠে। ঐখানেই তো সংসারের রহস্য।

শুনেছ, কাল কায়ার জন্মদিন।

বিস্মিত তারিণী শুধান, কায়ার তো কখনো জন্মদিন হয়নি!

কেন ওকি জন্মায় নি?

তা বটে। কিন্তু ওসব তো আগে কখনো হয় নি।

এবার থেকে হবে।

তারিণীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, এসব হাঙ্গামা কখনো ঘটেনি তাছাড়া খরচপত্রও আছে, তবু শুধান, তবে ছায়াকে পাঠিয়ে দিলে কেন?

কায়ার জন্মদিন তো ছায়া কি করবে!

আনন্দ করবে।

সে ওখানে বেশ আনন্দে আছে। নাও এখন যা বলি করো, দু' চার জন লোককে নিমন্ত্রণ ক'রো, সকাল বেলায় যেন আসে।

বেশ তো পোষ্টমাষ্টার বাবুকে বলবো, ডাক্তারবাবুকে বল্‌বো, হরিবাবুকে বলবো, আর কাকে বল্‌তে হবে বলো—

সারদাবাবুকে বল্‌বে, সন্তকে বলবে।

বেশ, বেশ।

তিনি প্রস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে গৃহিণী বলিলেন, আর ঐ সঞ্জীববাবুকে বল্‌তে ভুলোনা, বিদেশী লোকটা একা প'ড়ে আছে।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া তারিণী প্রস্থান করিলেন, রুগ্‌ণা স্ত্রীকে তিনি ভয় করিতেন, যতদূর সাধ্য দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

সঞ্জীব এবাড়ী আসা ছাড়িয়াছে, তাহাকে পুনরায় কি উপায়ে এবাড়ী আনা যায় চিন্তা করিতে করিতে ভবানী দেবীর মনে সহসা কায়াব জন্মদিন পালন করিবার কথাটা আসে, জন্মদিনটাও সুযোগ বুঝিয়া কাছে আসিয়াছিল। ভবানী ভাবিলেন এই উপলক্ষ্যে আবার দুইজনকে মুখোমুখী করিয়া দেখা যাক্ কি হয়।

নিমন্ত্রণের আসল লক্ষ্য ঐ সঞ্জীব, যদিও তার নামটাই তিনি সব চেয়ে অবান্তর ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মেয়ের হইয়া ঘটকালি করিতে কোথায় যেন একটুখানি কুণ্ঠার মতো তাঁহার মনে ছিল।

বাপেব মুখে ব্যাপার শুনিয়া কায়া আসিয়া বলিল, মা আবার ওসব কেন?

কি সব?

ঐ জন্মদিনের হাঙ্গামা—ওতো কখনো হয়নি।

এবার হবে।

কায়া দ্বিধার সঙ্গে বলিল না, মা।

আমি মরলে তেরাত্তিরও পোয়াবে না, তারপরে তোমাদের নূতন মা এলে যা হয় ক'রো, এখন যা বলি শোনো।

কি যে বলো মা।

তা হলে যা বলি চুপ করে শুনে যাও।

আমার যে ভারি লজ্জা করবে।

ভবানীর ইচ্ছা হইল বলেন যে আর ঐ লোকটা দু' পায়ে ঠেলে ফেলছে তা'তে লজ্জা করে না! কিন্তু ও কথা তো আর স্পষ্ট বলা যায় না, তাই বলিলেন, লোকের কাছে আশীর্ব্বাদ নিবি তাতে আবার লজ্জা কিসের?

দিদি থাকলে বেশ হতো!

ভবানী চুপ করিয়া থাকিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, দিদি থাকিলে তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিত কে! নাঃ এই বোকা মেয়েটা কিছু বোঝে না।

যাও এখন।

কায়া নিমন্ত্রিতদের তালিকা শুনিয়াছিল, সঞ্জীব আসিবে শুনিয়া লজ্জাও হইল, ভয়ও হইল, আবার এক প্রকার সূক্ষ্ম আনন্দও হইল, মোট কথা রাত্রিটা তার স্বপ্নে, জাগরণে, তন্দ্রায়, অস্বস্তিতে কাটিয়া গেল।

বাড়ীর বারান্দায় অভ্যাগতগণ বসিয়াছেন। ভোজন ও আশীর্ব্বাদের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। পোষ্টমাষ্টার বাবু ও ডাক্তার বাবু একবার দেখা দিয়াই কাজের অজুহাতে চলিয়া গিয়াছিলেন, হরিবাবু প্রভৃতি স্থানীয় লোকেরাও আবার পরে দেখা হবে বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সন্তু একটা কাঠবিড়ালীর পিছু পিছু ছুটিয়াছিল, আর ফেরে নাই। সারদাবাবু ও তারিণী-বাবু সদালাপ করিতেছেন। সঞ্জীব নীরবে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, কায়া দরজার কাছে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায়

দণ্ডায়মান, আর ঘরের মধ্যে উৎকর্ণ অবস্থায় ভবানী দেবী জন্মদিনের ফলাফল শুনিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সঞ্জীব কায়ার সঙ্গে কথা বলে নাই, একথা সত্য নয়! এক ফাঁকে দুজনে এক পশলা কথোপকথন হইয়া গিয়াছে।

কায়া কেমন আছ?

ভালই।

তোমাকে যে আর দেখ্‌তে পাই না?

আপনি তো এদিকে আসেন না।

তা বটে! মাঠের দিকে যাই, রোদ্দুরটা ভারি ভালো লাগে।

তারপর আবার দুই জনে নীরব।

কোন কোন ক্ষেত্রে নীরবতা পূর্ণ, কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্য। এক্ষেত্রে শূন্য।

কোন পক্ষ হইতেই ছায়ার কথা উঠিল না। কায়ার ইচ্ছা হইতেছিল একবার ছায়ার কথা ওঠে, তাহাতে সঞ্জীববাবুর মনের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সঞ্জীব সে দিক দিয়া গেল না, কায়াও লজ্জায় উঠাইতে পারিল না।

এমন সময়ে ডাকপিওন আসিয়া তারিণীবাবুকে খান কতক চিঠি দিল, সারদাবাবুকে খান দুই দিল, আর সঞ্জীবের হাতে একখানা খামের চিঠি দিয়া প্রস্থান করিল।

অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—এ আবার কে লিখ্‌লো?

কিন্তু খাম খুলিল না, পাশে রাখিয়া দিল।

কায়া মুহূর্তমধ্যে হস্তাক্ষর দেখিয়া লইল, বুঝিল ছায়ার চিঠি!

ওঃ তাই বলো, দু'জনে বেশ চিঠিপত্র চলে। আবার লোকটার ন্যাকামি দেখো—'এ আবার কে লিখ্‌লো'। ন্যাকা নাকি! ভাবিতে ভাবিতে রাগে, হিংসায়, ভণ্ডামির প্রতি ধিক্কারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পাশের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার চোখে জল আসিল না, তার বদলে একটা অব্যক্ত, অস্পষ্ট, অভিযোগ ও অভিশাপ কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহাদের মা ভাবিতেছিলেন, নীরবতার আড়ালে দু'জনে এতক্ষণ চোখে চোখে মন বিনিময় হইতেছে। বয়স কালে এমন হইয়া থাকে তিনি শুনিয়াছিলেন। আনন্দে ও কল্যাণকামনায় তাঁহার মাতৃহৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

কায়া চলিয়া যাইতে সঞ্জীব আবার চিঠির হস্তাক্ষরের দিকে তাকাইল, এবারে বুঝিল নারীর হস্তাক্ষর। তাহাকে চিঠি লিখিতে পারে এমন মেয়ে ছিল না। হঠাৎ বেদনার বিদ্যুৎ ঝলকে চকিতে মনে হইল ছায়ার হস্তাক্ষর নয় তো! তাই বটে। ছায়ার একখানা বইয়ে যে নাম লেখা দেখিয়াছিল সেই ছাঁদেরই তো লেখা বটে! নিভৃতে চিঠিখানা পড়িবার আশায় সে উঠিয়া পড়িল, তারিণী-বাবুকে সম্ভাষণ করিবার কথাও তাহার মনে পড়িল না।

মাঠের মধ্যে যেদিকে হয় সে চলিতে লাগিল, কোন্‌ দিকে যাইতেছে দেখিল না, কারণ চোখ দুটি ঐ হস্তাক্ষরের দিকে নিবদ্ধ। ছায়ার হস্তাক্ষর সন্দেহ নাই। তাহার মনে হইল ছায়ার ব্যক্তিত্ব, লতা যেমন কঞ্চিকে জড়াইয়া জড়াইয়া ওঠে, তেমনি ঐ লেখার গাঁঠে গাঁঠে জড়িত। সে ছুটিয়া চলিয়াছে কি হাঁটিয়া চলিয়াছে, কি নাচিয়া চলিয়াছে সে খেয়াল তাহার ছিল না, মাঠের নাবালে এক

জায়গায় আসিয়া একটা মহুয়া গাছের তলায় সে বসিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিখানা তখনি খুলিল না। শিশু যেমন কিছুক্ষণ নূতন খেলনাটা মুঠায় চাপিয়া বসিয়া থাকে, খেলে না, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা খেলনাটাকে অনুভব করিতে, আয়ত্ত করিতে চায়, মুষ্টিবদ্ধ চিঠিখানার প্রতি তেমনি তাহার ভাব। সে যেন ছায়ার হাতখানি ধরিয়া বসিয়া আছে। ছায়া চলিয়া যাইতে পৃথিবীর যে রঙ জ্বলিয়া গিয়াছিল, আবার সেই রঙ নূতন সৌন্দর্য্যে, নূতন মহিমায় পৃথিবীকে ভূষিত করিল। তাহার মনে হইল পাহাড়ের ঐ নীলিমায় ছায়ার চোখেরই নীলাভা, দিগন্তের ঐ বঙ্কিম বনরেখা ছায়ারই সুকুমার ভ্রূ-লতা, ঐ যে ওখানে সুডোল, নিটোল মহুয়া ফুলটি পড়িয়া আছে, ও যেন ছায়ারই চারু পাণ্ডুর কপোলের আভাস বহন করিতেছে। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অধরোষ্ঠ ধ্বনিত করিতে লাগিল—'তার চোখের তারায়, যেন গান গায় অরণ্য পর্বত'।

এতক্ষণ সে যেমন ধৈর্য্যের সঙ্গে চিঠিখানা চাপিয়া বসিয়া ছিল, এবার তেমনি ব্যস্ততায় এক টানে খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল। খাম ছিঁড়িয়া ফেলিতেই আশাভঙ্গের আঘাতে, বৃহৎ প্রত্যাশার বৃহৎ ব্যর্থতায় তাহার মন এতটুকু হইয়া গেল। মাত্র এই ক'টি কথা, এমন নৈর্ব্যক্তিক, এমন দূরাপহত!

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আসবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে পারিনি। সে জন্য লজ্জিত। আশা করি মনে কিছু করেন নি। ইতি ছায়া।"

কোন সম্ভাষণ নাই, কোন কোমলতা নাই, কোন ঠিকানা নাই, কাজেই কোন প্রত্যাশাও নাই। এইটুকু! মাত্র এইটুকু!

সঞ্জীবের মনে হইল সে কি মূঢ়! উর্ণ তন্তুতে দোলনা টাঙাইয়া সে দুলিতে উদ্যত হইয়াছিল! ধিক্! চিঠিখানা বারংবার পড়িয়াও আর কোথাও কোন আশার আভাস দেখিতে পাইল না! এ চিঠি লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? সে বেশ বুঝিল এ চিঠিতে হৃদয়ের এতটুকু স্পর্শ নাই, আছে কেবল নীরস নৈর্ব্যক্তিক ভদ্রতা! সে নিতান্ত মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল। পাহাড়ে পাহাড়ে রঙ বদলাইতে লাগিল, বনে বনে ছায়া পড়িতে লাগিল, প্রান্তরের বিস্তৃত শতরঞ্চের ছকে ক্ষণে ক্ষণে আলোছায়ার পাশা গড়াইতে লাগিল আর দিগন্তব্যাপী মরীচিকার বন্যা প্রহরে প্রহরে কেবল বাড়িয়াই চলিল। ঐ ক'টি অক্ষরের মধ্যে একটি ক্ষতবিক্ষত নারী-হৃদয়ের ব্যর্থতা বেদনা, আকাঙ্ক্ষা বাসনা, প্রথম প্রেম ও প্রথম বিচ্ছেদ কি সঙ্কোচে ও কি ব্রীড়ায় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া আছে একথা বুঝিবার মতো মনের অবস্থা সঞ্জীবের ছিল না।

১৪

সেদিন সকালে বাড়ী ফিরিয়া সঞ্জীব একটা ব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করিল, ওঠ্ ওঠ্ সাজ্ সাজ ভাব। কি ব্যাপার সে ভাবিতেছে, এমন সময়ে সারদাবাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, মাষ্টার মশাই, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? নিন, তৈরী হ'য়ে নিন।

কি ব্যাপার?

আর কি ব্যাপার, আমরা কল্‌কাতা যাচ্ছি।

কল্‌কাতা! সঞ্জীব বিস্ময় প্রকাশ করে।

হাঁ, আবার কোথায়, নিন প্রস্তুত হন গে।

সে কি! এখনো কল্‌কাতা থেকে লোক পালিয়ে আসছে, এই সেদিনও বোমা পড়েছে।

ওসব কিছু নয়, ভিতরের ব্যাপার শুনেছি।

কে বল্‌ল?

হেজিপেজি লোক নয়, একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আজ সকালে এসেছেন, সব ব'লে গেলেন।

কি বল্‌ছেন?

ঠিকই বলছি। বিশ্বাস না হয় তাঁর মুখেই শুনবেন, বিকালে আবার আসবেন। এখন যাওয়ার জন্যে তৈরী হন।

আমার আবার তৈরী হওয়া কি, উঠ্‌লেই হ'ল।

বেশ তবে উঠ্‌বার জন্যে তৈরী হ'য়ে থাকুন।

বিকাল বেলা কলেজের উক্ত প্রিন্সিপ্যাল বেড়াইতে আসিলেন। সারদাবাবু তাঁহাকে বলিলেন, স্যার, একবার আমাদের এই মাষ্টার মশাইকে সব বুঝিয়ে বলুন তো, ওঁর বিশ্বাস এখনো কল্‌কাতা নিরাপদ নয়।

সঞ্জীব দেখিল ছয় ফুট লম্বা এক ভদ্রলোক, গায়ে বালাপোষ, পায়ে চটি, হাতে লাঠি, মুখমণ্ডলের অনেকটা কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন, ওষ্ঠাধরে হাসি, চোখে বিহ্বলভাব, সব সুদ্ধ মিলিয়া কেমন একটা ঋষি-ঋষি ভাব।

সঞ্জীব নমস্কার করিল। প্রিন্সিপ্যাল লাঠি সুদ্ধ ডান হাতখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া সংক্ষেপে প্রতি-নমস্কার সারিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং লাঠিখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়া বলিলেন, নির্ভয়ে যান, কোন দুশ্চিন্তা নেই।

সঞ্জীব বলিল, কিন্তু স্যার এখনো যে লোক পালাচ্ছে।

যারা পালাবার তারা পালাবেই, তাই ব'লে আপনারা এই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে প'ড়ে থাকবেন কেন?

সারদাবাবু নীরবে মাথা ঝাঁকাইয়া শেষের কথা কটির সমর্থন করিলেন।

কিন্তু এই সেদিনও যে বোমা পড়েছে।

তবে আসল কথা বলি শুনুন—এই বলিয়া এদিক ওদিক একবার তাকাইয়া লইয়া গলা খাটো করিয়া আরম্ভ করিলেন।

সারদাবাবু সংযত হইয়া বসিলেন।

ও সব আমাদের প্রভুদের কীর্ত্তি।

সঞ্জীব শুধাইল, প্রভুদের? কার? ইংরাজের?

চাপা গলায় প্রিন্সিপ্যাল বলিলেন, হাঁ, আবার কার?

কিন্তু তারা এমন করতে যাবে কেন?

কিছুই জানেন না দেখছি—এই বলিয়া একবার ঋষিযোগ্য হাসি হাসিলেন, একবার লাঠিখানার মাথায় হাত বুলাইলেন, তার পরে পুনরায় মৃদু স্বরে আরম্ভ করিলেন—জাপানীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ভয় জাগিয়ে দিতে চায়, আর কেন। জাপানীরা যে আমাদের ভাই বেরাদার, ইংরাজ তাড়াবার জন্যেই যে তারা আসছে এইটে যাতে আমরা মনে না করতে পারি তাই নিজেরা বোমা ফেলে জাপানীদের নামে দোষ দিচ্ছে।

সে কি?

ঐ তো দেখুন না কেন, সাহেব-পাড়ায় তো বোমা পড়েনি পড়েছে হাতীবাগানে! ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে সঞ্জীববাবু, অনেক ব্যাপার আছে।

সারদাবাবু নীরবে মাথা ঝাঁকাইলেন, ভাবটা—নিশ্চয়ই আছে।

সঞ্জীব বলিল, কিন্তু জাপানীরা যদি এ দেশে ঢোকে?

যদি কি! ঢুকবেই তো। পুরাণে আছে কিনা, এদেশে কলির রোষে পীতজাতি রাজত্ব করবে।

কিন্তু তা হলে আর ইংরাজ তাড়িয়ে কি লাভ?

কিসে আর কিসে! জাপানীরা যে আমাদের ভাই বেরাদার, বৌদ্ধ, এশিয়ার জাত।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওরা এদেশে ঢুকলে বিশৃঙ্খলা হবে না? লড়াই তো হবে।

লড়াই করবে কে?

কেন ইংরাজ।

এবারে প্রিন্সিপ্যাল হাসিয়া উঠিলেন, ইংরাজ আগের দিন স'রে পড়বে, বোম্বাইতে জাহাজ তৈরি, এই বলিয়া তিনি বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলাইলেন।

তা ছাড়া জাপানীরা তো কল্‌কাতার দিকে আসবে না, আসামে ঢুকে হিমালয়ের কোল দিয়ে দিয়ে সোজা দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হবে, আপনার ভাবনাটা কিসের?

সারদাবাবু একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুনিতেছিলেন, এবারে প্রতিধ্বনির মতো বলিলেন, আপনার ভয়টা কিসের?

সঞ্জীব শুধাইল, এ সব আপনি জানলেন কি ক'রে?

এ সব আমরা জানি কিনা!

এই বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন, ভাবটা অব্যাপারীকে এর বেশি বলা চলে না। তারপরে নীরবে বসিয়া মাঠের দিকে তাকাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পা নাচাইতে লাগিলেন।

অতঃপর চা আসিল। চা পান করিয়া রুমাল সহযোগে গোঁফ-দাড়ি বেশ মুছিয়া লইয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিলেন।

এবারে অনেকক্ষণ আধিভৌতিক আলোচনা হইয়াছে ভাবিয়া সারদাবাবু বলিলেন, স্যার একটা স্তোত্রপাঠ করুন শুনি।

অমনি এতক্ষণ যিনি পার্থিব রাজনীতির গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিতে-ছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে পট পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি চোখ বুজিয়া হাত জোড় করিয়া সুর সংযোগে আবৃত্তি সুরু করিলেন,

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগরলাভরণং।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয়দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং॥

সারদাবাবুরও চক্ষু মুদ্রিত, দুইজনে একতালে প্রত্যেক শ্লোকের শেষে প্রণাম করিতেছেন, কেবল সঞ্জীবের অমুদ্রিতচক্ষু। প্রিন্সিপ্যালের তন্ময় ভাব লক্ষ্য করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, একটা ঋষি বটে! যাহার প্রকৃত স্থান নৈমিষারণ্যে, সে কিনা আজ কলিকাতার একটা কলেজের বৃত্তিভুক্ প্রিন্সিপ্যাল। দেশের কি দুর্গতি।

একবার মন নড়িয়া যাইতেই চাটুজ্জে দম্পতির কাছে নরসিংপুর অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। প্রসন্নময়ী একটা ফুলকপি হাতে করিয়া জনে জনে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এইটুকু একটা ফুলকপি, দাম বলে কিনা চার আনা!

সারদাবাবু বলিলেন, আরে মাছের দামের সঙ্গে তো সমান হওয়া চাই। এতটুকু পোনা মাছের দাম কিনা একটাকা!

চাকর বাকর বুঝিল বায়ু বহে পুরবৈঞা। তাহারা আরম্ভ করিল, চালের পাথর আর বাছতে পারিনে মা।

সারদাবাবু ও প্রসন্নময়ী কোরাসে বলিয়া উঠিলেন, হবে না কেন, পাথর, পাথর কেবল পাথর, গুচ্চের পাথর।

সন্তু তাহার অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া দিল, বলিল, এখানকার কাঠবিড়ালীগুলো যেন কেমন! মোটেই ধরা দিতে চায় না।

পাঁপড়ির এসব নিন্দা ভালো লাগিতেছিল না, সে বলিল, নাও, ওখানে গিয়ে কাঠবিড়ালী ধরো।

বাড়ীময় বাঁধো, বাঁধো, সাজো সাজো, ওঠো ওঠো রব।

সারদাবাবু বলিলেন, কল্‌কাতায় গিয়ে বোমা খেয়ে মরি সেও ভালো। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়।

নয়ই তো, নয়ই তো, গৃহিণী বলেন।

পাঁচজনের ধাপ্পায় প'ড়ে এই পাথুরে দেশে এসে বেরিয়ে গেল কতকগুলো টাকা।

এই বলিয়া সারদাবাবু বসিয়া পড়িলেন, বলেন, এর তুলনায় কল্‌কাতা স্বর্গ! স্বর্গ।

পাঁপড়ি মনে মনে বলে, বোমার ঘায়ে স্বর্গেই যেতে হবে, চিন্তা নাই। প্রকাশ্যে হাসিয়া ওঠে।

গৃহিণী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুইও চল্ আমাদের সঙ্গে পাঁপড়ি।

সে বলে, না, মা, আমি ছোট লোক, বড়লোকের স্বর্গ আমার সইবেনা। এই নরসিংপুরই আমার স্বর্গ।

সে হাসিয়া ওঠে।

সন্তু বলে, হাসি বেরিয়ে যাবে, যেদিন ভালুক ধরবে।

এখানকার ভালুকে ধরে না। নীলমণিকে দেখনি ?

সঞ্জীবও যাইবার জন্যে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে এখানে থাকিবে কি জন্যে ? আর থাকিবেই বা কোথায় ? সে আরও ভাবে, ছায়া থাকিলে না হয় কোন ছুতায় থাকিয়া যাইত। এখন তাহার কাছে নরসিংপুর ও কলিকাতা সমান। কিম্বা কলিকাতাই হয়তো শ্রেয়; কারণ সেখানে ছায়ার দেখা মিলিলেও মিলিতে পারে। ছায়া কলিকাতা গিয়াছে কিনা তাহার সন্দেহ ছিল, কারণ সেখান-কার মেয়েদের কলেজগুলো বন্ধ বলিয়া সে জানিত। তবে কলিকাতায় না গেলেও নরসিংপুরে যে নাই সে তো দেখাই যাইতেছে।

যাইবার আগের দিন পথে তারিণীবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা হইল, জানাইল যে সে সারদাবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে। একবার ভাবিল ছায়ার ঠিকানা শুধায়, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকিল, শুধানো আর হইল না।

সে নিভৃতে একবার ছায়ার চিঠিখানা বাহির করিয়া দেখিল, ঠিকানা নাই। যাহা নাই শতবার সন্ধান করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। ডাকঘরের মোহর অস্পষ্ট।

তারপরে একদিন সপরিবারে সারদাবাবু ষ্টেশন রওনা হইলেন। পাঁপড়ি একটা বিস্কুটের কৌটা সন্তুর হাতে দিয়া বলিল, এই নাও।

কি আছে ?

চেয়ে দেখো।

সন্তু ফুটা দিয়া চাহিয়া দেখে, একটা কাঠবিড়ালী এক কোণে গুটিশুটি হইয়া বসিয়া নীরবে টুলটুল করিয়া তাকাইয়া আছে।

ধরলি কেমন করে ?

পোষা। দেখো, খেতে দিতে ভুলো না, নইলে সত্যি সত্যিই স্বর্গ পাবে।

সঞ্জীব গাড়ীতে উঠিবার সময়ে পাঁপড়ির হাতে একটা টাকা দিল। সে টাকা-টা দেখিল না, কেবল বলিল, তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে দাদাবাবু।

কেন রে?

নরসিংপুরের জল একবার যার পেটে গিয়েছে তার বেশিদিন দূরে থাকবার উপায় নেই।

এই বলিয়া সে হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রিক্সাগুলা ছুটিয়া চলিল।

সঞ্জীব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পাঁপড়ি তখনো বারান্দায় তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনে হইল পাঁপড়ি যেন একবার চোখ মুছিল। তাহার কেবলি পাঁপড়ির শেষ কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল, তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে দাদাবাবু, তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে।

১৫

মাসখানেক পরে সঞ্জীব একদিন হঠাৎ নরসিংপুরের সেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রিক্সার শব্দ শুনিয়া ভিতর হইতে পাঁপড়ি বাহির হইয়া আসিল, সঞ্জীবকে দেখিয়া সে মোটেই বিস্মিত হইল না, বরঞ্চ যেন প্রত্যাশিত ঘটিয়াছে এইভাবে বলিল, আমি জানতাম দাদাবাবু তোমাকে ফিরে আসতেই হবে।

বাক্স ও ব্যাগ নামাইতে নামাইতে সঞ্জীব বলিল, কেন রে ?

নরসিংপুরের জল দাদাবাবু, ওর টান বড় বেঁশি।

তুই দেখছি এখানেই আছিস।

আর কোথায় যাবো ?

থাকিস তো এখানে বুঝ্‌লাম কিন্তু খাস কোথায় ?

এ-বাড়ী ও-বাড়ী চেয়ে চিন্তে খাই, যেদিন জোটে নিজে রেঁধে খাই।

বেশ আজ রেঁধেই খাস, সঙ্গে আমার জন্যেও দুটো রাঁধিস—এই বলিয়া সে দুটো টাকা তার হাতে দিল।

কিন্তু দাদাবাবু তুমি যে হঠাৎ ফিরলে ?

ওখানে ভালো লাগলো না রে।

আর বাবুরা ?

তারা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গিয়েছে।

সন্তু ?

সারাদিন তোর কাঠবিড়ালীটাকে নিয়ে থাকে।

সেটা এখনো মরেনি তাহলে! আমি ভেবেছিলাম না খেতে পেয়ে ম'রে যাবে।

না খেতে পেয়ে! বেশি খেয়ে না মরে! সারাদিন সন্তু ওকে খাওয়াচ্ছে।

নাও দাদাবাবু তুমি পা ধুয়ে নাও, আমি চা করে আনি।

পাঁপড়ি বারান্দায় একখানা মাদুর বিছাইয়া দিল, সঞ্জীব বসিল, পাঁপড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

তখন ফাল্গুনের শেষ। শীত কমিয়াছে কিন্তু গরম পড়ে নাই। গাছের নূতন পাতা গজাইয়াছে কিন্তু এখনো পুরাতন পাতার রাশি

গাছতলায় পুঞ্জীকৃত। কলিকাতার কোলাহল ও জনতা হইতে এখানে আসিয়া একটি ভারি স্নিগ্ধ শান্তি সে অনুভব করিল, খুব গরমের সময়ে শীতল নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া উঠিলে যেমন আরাম অনুভূত হয় অনেকটা ঠিক তেমনি। তাহার সমস্ত দেহ মন হইতে স্বস্তির একটি আঃ শব্দ যেন উত্থিত হইল। সে বসিয়া বসিয়া সেই পুরাতন প্রান্তর অরণ্য পর্ব্বত দেখিতে লাগিল।

এমন সময়ে পাঁপড়ি চা ও চারটি মুড়ি লইয়া আসিল।

চা পান করিতে করিতে সঞ্জীব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হ্যাঁরে, তারিণীবাবুদের বাড়ীর জানালা দরজা সব বন্ধ কেন রে ?

ও তা জানোনা বুঝি ! ওরা সব চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে !

তাহার বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। কোথাও একটুখানি আশা হয়তো ছিল !

কেন চলে গেল রে ?

এখানে থাকবে কোন্ দুঃখে ? ছায়াদিদিদের মা যে মারা গেল।

মারা গেল, বলিস কি ! কতদিন ?

তা, তোমরা যাওয়ার কিছুদিন পরেই।

কি হ'য়েছিল ?

অনেকদিন থেকে ভুগছিল, তোমরা যাবার পরেই বাড়াবাড়ি হল।

পাঁপড়ি যেটুকু জানিত বলিল। ভবানী দেবীর মৃত্যুর আসল কারণ গূঢ়। সঞ্জীবের চলিয়া যাইবার পরেই তিনি বুঝিলেন তাঁহার আশা নির্ম্মূল হইল। জীর্ণ দেহ আশা-ভঙ্গের আঘাত সহ্য করিল না। এতদিন তিনি মনের জোরে বাঁচিয়া ছিলেন। কায়ার বিবাহের আশা দূর হইতেই মন ভাঙিয়া পড়িল। তিনি মারা

গেলেন। শেষমুহূর্ত্ত আসন্ন বুঝিতে পারিয়া স্বামীর দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি আবার বিয়ে করো, আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি। কিন্তু তার আগে কায়ার বিয়ে দিয়ে ফেলো।

ছায়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমি ওর জন্যে ভাবনা করিনে।

অসুখের বাড়াবাড়ি শুনিয়া ছায়া আসিয়াছিল। তারপর তিনি চোখ বুজিলেন। কায়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছায়া স্থাণুবৎ বসিয়া রহিল, তাহার চোখে না জল, মুখে না শব্দ। ছায়ার সমস্তই অন্তঃসলিলা।

সঞ্জীব শুধাইল, তারপরে?

তারপরে আর কি। শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হ'লে সব চলে গেল।

কোথায়? কল্‌কাতায়?

তা তো মনে হ'ল না। উল্টো গাড়ীতে চড়লো।

সঞ্জীব ছায়াকে এতটুকু ভোলে নাই, এখন এই অশ্রুমার্জিত আব্-হাওয়ার মধ্যে বৃষ্টিধৌত আকাশে দূরের গিরিলেখা যেমন কাছে চলিয়া আসে, ছায়া তাহার হৃদয়ের আরও কাছে আসিয়া পড়িল।

ছায়া এসেছিল কি?

আগেই এসেছিল।

খুব কাঁদলো?

ছায়া দিদিমণির চোখে জল? কি যে বলো! কায়াদিদিমণিকে যদি দেখ্‌তে! সে কি কান্না।

ঐ কালো কুৎসিত মেয়েটির জন্য এতদিনে সঞ্জীব সত্যই বেদনা অনুভব করিল, ভাবিল, আহা।

ছায়ার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল?

দেখা হবে না। প্রতিদিন দেখা হ'তো। যাওয়ার আগের দিন এ বাড়ী বেড়াতে এসেছিল।

তাই নাকি! তা কি বল্‌ল?

বাবুর কথা, গিন্নিমার কথা, সন্তুর কথা, কত কথা জিজ্ঞাসা করল।

ব্যাকুল আগ্রহে সঞ্জীব শুধাইল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করলো?

আর কি জিজ্ঞাসা করবে বলো!

তাহার মন দমিয়া গেল, তবু শেষ চেষ্টার মতো শুধাইল—আর কি করলে?

তুমি যে ঘরটায় থাকতে সেখানে গিয়ে বসলো।

পুলকিত হইয়া উঠিয়া সঞ্জীব বলিল—সেই ঘরটায় বসলো!

আমি বল্‌লাম, দিদিমণি এঘরটা অন্ধকার, চলো বাইরে বড় ঘরটায় বসিগে। তা বল্‌ল, নারে এই ঘরটাই ভালো।

সঞ্জীব হঠাৎ পাঁপড়ির হাতে দুটো টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, তোর জামা নেইরে, একটা জামা কিনে নিস।

সঞ্জীবের আকস্মিক বদান্যতার হেতু বুঝিতে না পারিয়া পাঁপড়ি বলিল, জামা আবার কি হবে? শীত কেটে গেল।

তবে গরমের জামা কিনে নিস। তারপরে কি হ'ল রে?

ও সব বাজে কথা এখন থাক, তুমি স্নান ক'রে খাওগে। আমি দেখি ওদিকে ভাতের কি হ'ল।

ভাত ঠিক হবে। তুই বল্‌, তারপরে তোরা কি করলি?

হায়, অবোধ পাঁপড়ি কি করিয়া জানিবে যে বাজে কথার এত মূল্য, জানিলে না হয় স্মরণ করিয়া রাখিত, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হইলে না হয় দুটা বানাইয়া বলিত। কিন্তু এ দুইয়ের কোন সম্ভাবনা না

থাকাতে সে উঠিয়া পড়িল, বলিল, নাও তুমি স্নান করোগে, আমি ঘরে গেলাম।

পাঁপড়ি চলিয়া গেলে সঞ্জীব একাকী বসিয়া রহিল। উত্তাল ঢেউগুলা খড়কুটা ডালাপালা যাহা পায় তাহাই লইয়া যেমন আনন্দে লোফালুফি করিতে থাকে, সঞ্জীবের মন তেমনি ঐ অকিঞ্চিৎকর ঘটনাটিকে লইয়া দশ হাতে পরীক্ষা, স্পর্শ ও নিরীক্ষণ করিতে লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, এত ঘর থাকিতে ছায়া তাহার ঘরেই বসিয়াছিল, উঠিতে চায় নাই। 'এই ঘরটাই ভালো' উক্তিটি সঙ্গীতের মতো, রূপকের মতো, মন্ত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হাতে কোন কাজ না থাকায় সঞ্জীব বিকাল বেলায় মুরলীর বাড়ীর দিকে চলিল। কাছিমদহে পৌঁছিয়া দেখিল মুরলীর বাড়ী তালাবন্ধ, কেহ কোথাও নাই; না মানুষ না জন্তু জানোয়ার। সে ভাবিল এরা গেল কোথায়? অল্প দিন গিয়াছে এমন মনে হইল না, উঠানে যে পরিমাণ আবর্জ্জনা জমিয়াছে তাহা দীর্ঘ কালের অযত্নের চিহ্ন। সে দেখিল যে খোঁটায় নীলমণি বাঁধা থাকিত তাহার চার পাশে ঘাস জন্মিয়াছে, নখের আঁচড় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, দরজা জানলায় মাকড়সার জাল জমিয়াছে। ব্যাপার কি! কাছাকাছি কেহ নাই যে জিজ্ঞাসা করিবে। এমন সময়ে কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। দু'তিন নজর দেখিবার পরে সে বুঝিতে পারিল যে এ আর কেহ নয়, শ্রীমান্ সুরকি। কিন্তু এ কি, এমন কৃশ কেন! এমন লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা কেন! আর তাহার সঙ্গী শ্রীমান্ মুন্সীই বা কোথায়? সুরকি বোধ করি সঞ্জীবকে চিনিতে পারিয়াছে। তাই সে আক্রমণের উদ্যম করিল না; তাহার কাছে

বসিয়া পড়িয়া উৰ্দ্ধোত্থিত মুখের বড় বড় দুটি করুণ চক্ষু তাহার দিকে নিবদ্ধ করিয়া নীরব ভাষায় শুধাইতে লাগিল, 'কেন এমন হইল বলিতে পারো, কেন এমন হইল বলিতে পারো?'

সঞ্জীব বুঝিল আর দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফল নাই। সে ফিরিল। অন্নহীন কুকুরটি প্রভুর বন্ধুকে অনুসরণ করিবার চেষ্টামাত্র করিল না, দাওয়ার উপরে উঠিয়া বেশ গুছাইয়া বসিল। সঞ্জীব বুঝিল ঐখানে বসিয়া সে সারা রাত্রি পাহারা দিবে। এমন কত রাত্রি দিয়াছে, বোধ করি মুরলীরা বাড়ী ছাড়িবার পর হইতে দিতেছে। তাহার কেন জানি পাঁপড়ির কথা মনে পড়িল। সেই অবোধ মেয়েটাও তো অমনি বাড়ী আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। কেন? এ 'কেন'র উত্তর পাঁপড়ি বা সুরকি কেহই দিতে পারিবে না, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া সে বাসায় ঢুকিল না। তারিণীবাবুর বাড়ীর দিকে গেল। বাড়ীর বারান্দায় যেখানে ছায়ার সঙ্গে বসিয়া সে গল্প করিত, সেখানে বহুকালের ধুলার উপরে সে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে পড়িল পাঁপড়ি থাকিলে বলিত, এখানে কেন দাদাবাবু নিজের বাসায় চলো, কিম্বা ধুলাবালিগুলা ঝাড়িয়া দিই। তাহা হইলে সে উত্তর দিত, নারে না, এখানেই ভালো, এই ধুলাবালুই ভালো। তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, অপর কাহারো চোখে পড়িবার আশঙ্কা ছিল না, সে নিশ্চিন্ত মনে বেশ চাপিয়া বসিল।

সঞ্জীব ফিরিয়া গিয়া কলিকাতায় তাহার পুরাতন মেসে উঠিয়াছিল। ইস্কুল ছুটি, সারাদিন কাজ কৰ্ম্ম নাই, তেতালার ছোট

ঘরটিতে বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিত, ভাবিত ছায়ার সন্ধান পাওয়া যায় কি উপায়ে! তাহার কলিকাতার ঠিকানা জানিত না। তাহার কলেজের নামটা জানিত, কিন্তু তাহাও আবার বন্ধ। আর কলেজ খোলা থাকিলেই বা কি! ছায়ার দেখা পাইবার আশায় নবীন প্রেমিকের মতো কলেজের দরজায় গিয়া তো দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। দিনের অনেকটা সময় সে কলিকাতার জনবিরল পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, সময় কাটাইবার সে একটা উপায়। তা ছাড়া মনের মধ্যে একটুখানি আশার মতো ছিল হয় তো, এই ভাবে কখনো ছায়ার দেখা মিলিলেও মিলিতে পারে! কখনো কখনো দু'একখানি মুখ দেখিয়া ,পলকের জন্য চমকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, ছায়ার ছায়ামাত্র! কোন কোন দিন সারদাবাবুদের বাড়ীতে যাইত, শুনিত—কি জায়গাতেই না নিয়ে গিয়েছিলেন, শুচ্ছের পাথর; শুনিত—এখানে এসে বেশ আরামে আছি, আর বোমা? সে তো প্রভুদের কীর্ত্তি, জাপানীরা তো ভাই বেরাদার। মাঝে মাঝে সাইরেন ফুকরিয়া উঠিত। তাহার তেতালার মেসের অধিবাসীরা দ্রুত নীচে নামিয়া যাইত, সঞ্জীব নামিত না। সে জানিত ইস্কুল মাষ্টার মারিবার জন্যে কেহ বোমার অপচয় করিবে না। সে একাকী বসিয়া ছায়ার মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তরঙ্গে যেমন চাঁদের ছায়া ধরা পড়ে না, তাহার ব্যাকুল মনে ছায়ার মুখ ধরা দিত না, সব কেমন এলোমেলো হইয়া যাইত। অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, মনে মনে নরসিংপুরের টান অনুভব করিত, সেখানকার পাহাড় নদী অরণ্যের, সমস্ত সৌন্দর্য্যের, আর সেই সৌন্দর্য্যশতদলের মধুকোষটির, ছায়ার। সে জানিত খুব সম্ভব ছায়া সেখানে নাই। বাসা ভাঙিয়া গেলেও অবোধ পাখী তবু

তো মুগ্ধ আশায় সেখানে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। সে একদিন নরসিংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পড়িল।

সেই বারান্দায় একটা শাল কাঠের খুঁটি হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সঞ্জীব চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল, হয় তো অনেক দিন পরে স্থান-মাহাত্ম্যে ছায়ার মুখ অবিকল মনে ধরা দিয়াছিল। যখন চোখ মেলিল দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। এ দৃশ্যটি আগে দেখে নাই। দিগন্তে পাহাড়ে পাহাড়ে আগুনের রেখা! পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সর্পিল গতিতে সেই রেখা অগ্নিময়ী নাগিনীর মতো উঠিতেছে, নামিতেছে, দূর দুরান্তে প্রসারিত হইয়া যাইতেছে। সে শুনিয়াছিল শীতের শেষে পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন ধরাইয়া দেয়—তবে এই সেই দৃশ্য! সে বসিয়া বসিয়া সেই অগ্নিরেখার দিগন্তব্যাপী জালফেলা দেখিতে লাগিল। তাহার চোখ অগ্নিরেখার নীরব সংক্রমণ দেখিতেছিল আর তাহার মন আর একটি অগ্নিময় নাগপাশকে অনুভব করিতেছিল। সেই অগ্নিপাশ ক্রমে তাহার সমগ্র অস্তিত্বকে আঁটিয়া ধরিতেছে। নিস্তার নাই, আর কেমন যেন নিস্তার পাইবার ইচ্ছাও নাই। সে ভাবিতেছে, আকাশের তারাগুলা ভাবিতেছে, বাতাসের স্পর্শে অদূরবর্ত্তী নিদ্রাহীন শালবনের এপাশ-ওপাশ ফিরিবার শব্দ, ছায়াশয্যায় শুইয়া সেই শালবনও ভাবিতেছে, কাহারও চোখে ঘুম নাই। চরাচরব্যাপী নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের স্রোতে নিস্তব্ধতার ভেলায় কোন্ বিরহিণী ভাসিয়া চলিয়াছে, চলমান প্রহরের মৃদু মৃদু আঘাতে ভেলাখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ছায়ার বিচ্ছেদের সূচীমুখে আজ একটি নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ সে করিল, সঞ্জীব বুঝিল, বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যই অন্তর্ব্যাপী প্রেম, সে বুঝিল চোখে যাহা সুন্দর

মনে তাহাই প্রেম ; সৌন্দর্য্য ও প্রেম একই উত্তরীয়ের এপিঠ ওপিঠ। প্রেমরূপিণী ছায়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সৌন্দর্য্যরূপিণী ছায়া এখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে নীরবে বসিয়া রহিল।

রাত্রি বেলায় পাঁপড়ি বলিল, দাদাবাবু এই বড় ঘরটায় তোমার বিছানা ক'রে দিই।

সে বলিল, নারে আমার ঐ ছোট ঘরটাই ভালো, ওখানে বিছানা ক'রে দে।

হতবুদ্ধি পাঁপড়ি বলিল, তোমরা কি যে বোঝো!

তোমরা! সঞ্জীবের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। অন্ততঃ একটি অবোধ বালিকার মনেও তো তাহারা দুইজনে গলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তোমরা!

অন্য অবান্তর কথার আঘাতে পাছে মনের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা নষ্ট হয়, সে তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

১৬

পরদিন সকালে সঞ্জীব শুধাইল, হ্যাঁরে পাঁপড়ি, মুরলীরা কোথায় গেল রে? কাল ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম, খালি দেখলাম।

তা জানোনা বুঝি দাদাবাবু, মুরলী তামার কলে কাজ করতে গিয়েছে।

তামার কলে! হঠাৎ কেন?

হঠাৎ হয়নি, ওর বউটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছে।

নীলমণির কি হল?

কি জানি! হয় তো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে, হয় তো ওর বউটা বেচে দিয়েছে।

বেচে দেবে কিরে?

তাছাড়া কি করবে? বউটা দুচক্ষে নীলমণিকে দেখতে পারতো না।

তুই এত জানলি কি করে!

নরসিংপুরের সবাই জানে।

সঞ্জীব বুঝিল কথাটা মিথ্যা নয়। সেও ইতিপূর্ব্বে কিছু টের পাইয়াছে। তবে সত্য সত্যই যে মুরলী যাইবে, এত শীঘ্র যাইবে ভাবিতে পারে নাই।

সঞ্জীব বলিল, চল্‌না, ওদের একবার দেখে আসি।

তোমার ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাবো না।

কেন রে, এত রাগ কিসের?

রাগ হবে না! একদিন আমার সঙ্গে মুরলীর বউয়ের দেখা হয়েছিল, আমি বল্‌লাম, মুরলী নাকি তামার কলে কাজ করতে যাবে? তা মুখপুড়ী কি বলে জানো? বলে যে তা যাবে কেন! মাঠে মাঠে ভালুক নাচিয়ে বেড়াবে! আমি বললাম, তা মন্দ কি! তখন ও বলে, ও যখন তোকে বিয়ে করবে তখন তোরা দুজনে ভালুক নাচিয়ে বেড়াস। এই বলে মল ঝমঝম করে চলে গেল।

মুরলীর বউ কি মল পরে নাকি!

তা পরবে কেন! ও একটা কথার কথা বল্‌লাম। এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

আচ্ছা বেশ, তুই না যাস, আমিই একবার বিকাল বেলা যাবো, দেখে আসি মুরলী কেমন আছে, আর নীলমণিরই বা কি গতি হল।

বিকাল বেলা সঞ্জীব তামার কারখানার দিকে চলিল। সহর হইতে মাইল দুই দূরে নদীর ধারে তামার কারখানার ছোট সহরটি। সেখানে পৌঁছিয়া সঞ্জীব বুঝিল মুরলীকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। সে শুনিয়াছিল যে কারখানায় তিন চার হাজার লোক কাজ করে, তার মধ্যে মুরলীকে কি উপায়ে খুঁজিয়া বাহির করিবে! মুরলী বলিলে কে চিনিবে? সহরে ঢুকিতেই সারি সারি বারাক, মজতুরদের আশ্রয়। সে দেখিল এক জায়গায় কয়েক জন ধোপা কাপড় কাচিতেছে, ভাবিল ওখানে গিয়া মুরলীর সন্ধান করিবে। কিন্তু তাহার ভাগ্য ভালো, ততদূর যাইতে হইল না। দেখিল একটি কল হইতে কয়েকটি মেয়ে জল লইতেছে, তাদের মধ্যে একজন মুরলীর স্ত্রী ইন্দু।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল, ইন্দু যে! তোমরা কোথায় আছ?

ইন্দু মাথায় কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, হাতের বালতি রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল, বাবু যে, কবে এলেন?

কাল এসেছি। বিকালে তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সব খালি দেখলাম।

ইন্দু এক গাল হাসিয়া বলিল—আমরা যে এখানে চলে এসেছি।

সেই কথা শুনেই তো তোমাদের দেখতে এলাম। কোথায় আছ, কেমন আছ?

খুব ভালো বাবু, এতদিনে ভদ্দরভাবে আছি।

তা বেশ! মুরলী কোথায়? নীলমণির কি হ'ল?

সে সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে বলিল, আসুন বাবু, 'কোয়াটারে' আসুন। তারপরে সে সঙ্গিনীদের উদ্দেশ্যে চাপা গলায় বলিল, কলকাতার বাবু।

ওর বেশি বলার প্রয়োজন হয় না। সঙ্গিনীরা বিস্ময়ের সঙ্গে সঞ্জীবকে এবং ঈর্ষ্যার সঙ্গে ইন্দুকে দেখিতে লাগিল। এদিকে সঞ্জীব ইন্দুকে অনুসরণ করিয়া তাহার 'কোয়াটারে'র উদ্দেশ্যে চলিল।

নিকটেই ইন্দুর 'কোয়াটার', অর্থাৎ সারিবদ্ধ শতাধিক বারাকের মধ্যে একটি খুপরি। টিনের দরজা খুলিয়া ইন্দু ঢুকিল, অগত্যা সঞ্জীবকেও ঢুকিতে হইল।

ইন্দু একটি মোড়া আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন বাবু।

সঞ্জীব দেখিল ইন্দুর 'কোয়াটারে' ছোট একটি ঘর, সম্মুখে একটা বারান্দা, আর তার নীচে ছটাক পরিমাণ উঠান। ঐটুকুর মধ্যে তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তার উপরে শতাধিক 'কোয়াটারে'র শতাধিক তোলা উনুনে তখন আগুন দেওয়া হইতেছে, তারই ধূম কুণ্ডলী সমস্ত আকাশটাকে ঘোলা করিয়া দিয়াছে। সে ভাবিল মানুষ যে কি সুখে সাধ করিয়া এখানে আসে! মুরলীর বাড়ীর খোলা মেলার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে নিতান্ত বিষণ্ণ বোধ করিতেছিল।

ইন্দু বলিল, আপনি একটু বসুন বাবু, আমি চা ক'রে আনি, আমার উনুনটা এখনো ধরেনি।

নিষেধ করিলেও শুনিবে না ভাবিয়া সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল।

সঞ্জীবকে চা পান করানো ছাড়াও ইন্দুর আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। তাহার ঘরে যে কলিকাতার বাবুরা আসাযাওয়া করেন, অপরের উনুনে চায়ের জল গরম করা উপলক্ষ্যে প্রতি-বেশিনীগণকে এই সুসংবাদটি বিতরণ করিতে হইবে তো!

সঞ্জীব চায়ের পেয়ালা হাতে লইলে ইন্দু দাওয়ার উপরে বসিল।

এখন শুনি কেমন আছ?

এখানে খারাপ থাকবার কি উপায় আছে? দেখুন না কেমন পাকা বাড়ী, এই যে বিজলি বাতি, আর ঐ তো কলে জল নিচ্ছিলাম তা তো দেখেই এলেন। সব এখানে ভদ্দরলোকের মতো।

সঞ্জীব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, মুরলী কোথায়?

কারখানায় গিয়েছে। পাঁচটার ভোঁ দিলেই আসবে, এলো ব'লে, সময় হ'য়েছে।

যায় কখন?

ন'টার ভোঁ বাজতেই 'জয়েন' করতে হবে। তার পনেরো মিনিট আগে একটা ভোঁ বাজে, তখনি রওনা হ'য়ে যায়।

তাহার মুখে ইংরাজি শব্দের অপভ্রংশ শুনিয়া সঞ্জীব বুঝিল, ইন্দু কেবল সুখে নাই, শিক্ষাতেও তাহার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

বেশ, বেশ, তা নীলমণির কি করলে?

বড় সাহেবকে ভেট দিয়েছি।

এমন বিনা ভূমিকায় কথাটা সে বলিল যে সঞ্জীবের বুকে অপ্রত্যাশিত আঘাত করিল। কিন্তু তখনি বুঝিল ভূমিকা না থাকিলেও খুব সম্ভব সংবাদটির উপসংহার আছে। তাই শুধাইল, এমনি দিলে!

অমনি কি আর হয় বাবু! বলতে হয় ভেট। আর তা ছাড়া বড় সাহেব অমনি নেবে কেন? কি পেয়েছি দেখুন না—এই বলিয়া উল্লসিত গৌরবে কান ও হাতের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সঞ্জীব দেখিল আগের ছোট দুলের বদলে এক জোড়া বড় রূপার দুল আর হাতে আগের রূপার চুড়ির উপরে কয়েক গাছা নূতন চুড়ি।

একটি হৃদয়হীন কাণ্ডের সরল রূপ দেখিয়া সঞ্জীব হাসিয়া ফেলিল, অন্য কাহারো মুখে শুনিলে নিঃসন্দেহ রাগিত।

মুরলী রাগ করলো না ?

এবার সাধ্বী স্ত্রীর গৌরবে সে উত্তর দিল—সে মানুষ আর নেই বাবু। এখন ইন্দুর কথায় ওঠে বসে। চোখেই সব দেখতে পাবেন, এলো বলে।

না জানি কি দেখিবে ভাবিয়া সে দুঃখিত হইল।

সুরকিকে ফেলে এলে কেন ?

কি যে বলেন বাবু। ও কি একটা কুকুর! আবার বৈশাখ মাসে যদি আসেন তবে কুকুর দেখ্‌তে পাবেন। হাঁ, বিলিতি কুকুর।

কৌতূহলী সঞ্জীব শুধাইল, কি রকম ?

ভালুকটা দিয়ে দিলে মানুষটা কেঁদে ফেল্‌ল, বল্‌ল, ইন্দু, নীলমণিকেও দিয়ে দিলি, সুরকিকেও আনলি না, কি নিয়ে থাকবো ?

আমি বললাম, কেন আমি আছি।

সে বলল, তাতো আছিস। তবে একটা জানোয়ার থাকলে মেলে ভালো।

তখন আমি বল্‌লাম, ভয় নেই, কালকে কুকুরের বন্দোবস্ত করবো।

তারপর বড় সাহেবের কাছে গিয়ে সেলাম করে জানালাম, হুজুর আমাকে একটা বিলিতি কুকুরের বাচ্চা দিতে হুকুম হোক।

সাহেবের অনেকগুলো বিলিতি কুকুর। সাহেব তখন চাপরাশিকে হুকুম দিলেন এবারে বাচ্চা হ'লে একটা যেন এই জেনানাকে দেওয়া হয়। বৈশাখ মাসে বাচ্চা হবে—এসে দেখে যাবেন। আরে রাম ওটা কি আর কুকুর!

বলিয়া সে সুরকির উদ্দেশ্যে ধিক্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

নীলমণি সাহেবের কাছে আছে কেমন?

খুব ভালো। সাহেব লোহার শিক দেওয়া খাঁচা ক'রে দিয়েছে, একটা চাকর ঠিক ক'রে দিয়েছে। তোফা আরামে আছে।

তুমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে যাও না!

আমি কি পাগল নাকি বাবু? তবে মাঝে মাঝে কুকুরছানার তদ্বির করতে যাই, তখন দেখ্‌তে পাই খাঁচার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শিকগুলো শুঁকছে, আমাকে দেখলে এমনি ক'রে দাঁত বার করে—বলিয়া মুখভঙ্গী করিল।

আমি বলি আমার জন্যেই তোর আজ এত সুখ, পশু না হ'লে আমার পায়ে গড় করতিস! শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে, জানোয়ার কি না!

তারপরে একটু থামিয়া বলিল, আচ্ছা বাবু, জানোয়ারে কি মানুষের কথা বুঝ্‌তে পারে?

সে কথার উত্তর না দিয়া সঞ্জীব শুধাইল—মুরলী দেখ্‌তে যায় না?

সে মানুষ আর নেই বাবু, জন্তু জানোয়ারের নেশা ছুটে গিয়েছে। তার বদলে এখন তাড়ি খায়। তা খাক্, পুরুষ মানুষের একটু আধটু নেশা ভালো। এলেই সব দেখ্‌তে পাবেন। ঐ যে ভোঁ বাজলো।

দীর্ঘপ্লুত তারস্বরে কারখানার সিটি কর্ম্মের পর্ব্বান্ত ঘোষণা করিল, এবং মিনিট দশেক পরেই টিনের দরজা খুলিয়া মুরলী ঢুকিল।

মুরলীর চেহারায় ও সঞ্জীবের আগমনে সঞ্জীব ও মুরলী দুজনেই বিস্মিত হইয়া গেল। মুরলী প্রথমে কথা বলিল, হুজুর আমাদের ভোলেন নি দেখছি। কবে এলেন!

সঞ্জীব দেখিল মুরলীর পরণে একটি হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছোট হাতের শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, সমস্ত তেলে ও কালিতে মলিন, মুখে এক পোঁচ কালি বিষাদের।

সঞ্জীব বলিল, কাল এসেছি, ভালই আছি। কাল বিকালে তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম খালি, শুনলাম তোমরা এখানে এসেছ, তাই ঘুরতে ঘুরতে একবার দেখতে এলাম।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কেমন আছ?

ভালই আছি হুজুর।

ভালই আছি বলিল বটে তবে তাহার মুখ চোখ সে কথার সমর্থন করিল না।

মুরলী ভালই আছি বলিবামাত্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্দু সঞ্জীবের দিকে তাকাইল, ভাবটা কেমন বলিয়াছিলাম না সে মানুষ আর নাই।

এখানে খাটুনি বুঝি খুব বেশি?

মুরলী উত্তর দিবার আগেই ইন্দু মুখ খুলিল—কিছু না হুজুর, কারখানায় একটুখানি ঘুরে আসা, তারপরে সারাদিন যা খুসী করো। আর যাই হোক মাঠে মাঠে ভালুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে অনেক ভালো। যাও এখন কাটাপোষাক খুলে ফেলো, খাও, ততক্ষণ আমি বাবুর সঙ্গে কথা বলছি।

মুরলী ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

এবার নিজে চোখে দেখলেন তো, কেমন মানুষের মতো হ'য়েছে।

ইন্দু যাহা দেখাইতে চায় সঞ্জীব এক পলকে তার বেশি দেখিয়া লইয়াছে, তাই চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মুরলী একখানা লুঙি পরিয়া বাহিরে আসিয়া দাওয়ায় বসিল। স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সম্মুখে একখানি থালায় কয়েকখানা রুটি ও তরকারী রাখিল, বলিল, আগে খেয়ে নাও তো দেখি।

সঞ্জীব বুঝিল ইন্দু যতই সত্যবাদিনী হোক তাহার যত্ন-আত্তিতে আন্তরিকতার অভাব নাই, বরঞ্চ স্বামীর বাধ্যতায় তাহা যেন আরও বাড়িয়াছে।

সাধ্বী স্ত্রী জড় স্বামী, মূর্খ স্বামী, পঙ্গু স্বামী, দরিদ্র স্বামী, নেশাখোর স্বামী, সব সহ্য করিতে পারে, কেবল অবাধ্য স্বামী নয়। স্বামীর অবাধ্যতার চেয়ে তাহার মৃত্যুও সাধ্বী স্ত্রীর কাছে শ্রেয়ঃ। স্বামীর বাধ্যতাতেই পত্নীজীবনের চরম সার্থকতা।

মুরলী হাত মুখ ধুইয়া সঞ্জীবের কাছে বসিল।

ইন্দু আরম্ভ করিল, এই দেখুন না কেন নরসিংপুরের লোকে এক ছটাক আটা পায় না, আমাদের এখানে অঢেল আটা, কোম্পানী ষ্টোর থেকে নিলেই হ'ল, জলের দর।

তোমাদের হাট-বাজার বুঝি দূরে?

কি যে বলেন হুজুর। রবিবারে কোম্পানীর মাঠে হাট বসে, যা চান পাবেন। আর এতবড় বাজার নরসিংপুরে কেন, টাটার এদিকে আর নেই।

সঞ্জীব মুরলীর দিকে চাহিয়া শুধাইল, কত পাও ?

মুরলী ইন্দুর দিকে তাকাইল। সঞ্জীব বুঝিল মুরলীর অধিকার, রোজগারের গুণিবার অধিকার ইন্দুর।

ইন্দু বলিল, দিন তিন টাকা বারো আনা। বাকি বকেয়া পড়বার উপায় নেই, বুধবারে হপ্তার দিন দিতেই হবে।

তারপরে স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, ভালুক নাচিয়ে কত পেতে একবার বলো না।

সে কি আর এত ?

তবে !

ঐ ছোট শব্দটি ধিক্কার, গৌরব ও আনন্দে পূর্ণ।

তখন লোকে ভালুক-অলা বল্‌তো আর এখন ?

তারপরে একটু থামিয়া আরম্ভ করিল, প্রথমে এসে খুব মনমরা হ'য়ে থাকতো, এখন বেশ হাসিখুশি। আমার ভাই বলেছিল, তুই কিছু ভাবিসনে দু'দিনে সব সেরে যাবে, আগে কারখানার রসে পাক। হ'লো তো তাই।

সঞ্জীব ভাবিল, কারখানার রস বস্তুটা কি ? তাড়ি কি ? কিন্তু ঐ অপরূপ রস সত্ত্বেও মুরলীর মুখে হাসিখুশী ভাব যে কতটা তা তো আজ স্বচক্ষে সে প্রত্যক্ষ করিয়া গেল।

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। সঞ্জীব বলিল, আজ উঠি।

মুরলী বলিল, আর একদিন আসবেন হুজুর !

ঐ বল্‌লেই হ'ল ! একটু এগিয়ে দিয়ে এসো। দেখোনি এখানকার বাবুরা কেমন ব্যবহার করে ! দেখো, শেখো, এখন ভালুক-অলার সহবৎ ছেড়ে বাবুদের সহবৎ শেখো। আচ্ছা বাবু আর একদিন আসবেন।

এই বলিয়া সে কলকারখানার বাবুদের পত্নীদের অনুকরণেই বোধ করি সঞ্জীবকে প্রণাম করিল।

দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল।

১৭

কিছুদূরে আসিয়া সঞ্জীব বলিল, মুরলী বলো তো কেমন আছ?

সঞ্জীবের কণ্ঠস্বরে মুরলী বুঝিল তাহার জীবনের দুঃখ সঞ্জীবের কাছে চাপা নাই। এদিক ওদিক্ তাকাইয়া সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না, হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সঞ্জীব অপ্রস্তুতের একশেষ।

কি হ'ল মুরলী, কি হ'ল! কেউ দেখবে যে।

এই অন্ধকারে কেউ দেখবে না—একটু প্রাণ খুলে কাঁদি হুজুর। অনেক দিন কাঁদিনি।

কাঁদবে কেন?

কাঁদবো না কেন হুজুর! আমার বাড়ী গেল, ঘর গেল, মুন্সী সুরকি গেল—আর, আর নীলমণি—

বাক্য শেষ করিতে পারিল না, আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হুজুর আপনি ঠিকই নিষেধ করেছিলেন, বলেছিলেন মুরলী বুড়ো বয়সে বিয়ে করিস না, বেশ তো আছিস। তা তখন কি হ'ল হুজুর, জেনে শুনে মাটি খেলাম! আমার সব গেলো।

সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে সঞ্জীব বলিল, এখানে এমন কি মন্দ আছ।

একি থাকা হুজুর। আগে পাঁচটা গাঁয়ের লোক মানতো, দশটা গাঁয়ের লোক চিন্‌তো। কত বড় বড় বাবু মুরলী ব'লে ডাকতো, ছেলে বুড়ো সর্দ্দার বলে সেলাম করতো। আর এখানে—

এখানে কি?

এখানে কেউ ফিরেও পোঁছে না। দু'হাজার কুলির মধ্যে আমি এক কুলি। আবার শখ ক'রে নিজেদের মধ্যে ওরা বলাবলি করে আর কুলি বলা চলবে না মজদুর বলতে হবে, সরকারের হুকুম। আচ্ছা হুজুর, কুলিকে মজদুর বল্‌লে তার কি মান বাড়ে?

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া চলিল, আরে বাপু কুলিই হও আর মজদুরই হও কাজ তো ঐ! তামার পাথর আগুনে ঠাসা।

কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া সঞ্জীব বলিল, সকলেই তো করছে।

সকলের কি অমন নীলমণি ছিল?

নীলমণির নাম উচ্চারণ করিবামাত্র আবার সে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, ওরে নীলমণি রে?

কাঁদছ কেন? শুনলাম নীলমণি বেশ আরামে আছে।

ঐ কি আরামে থাকা হুজুর! আমি জন্তু জানোয়ারের মনের কথা বুঝি, আমি নীলমণির মনের কথা বুঝি! ও আর বেশি দিন বাঁচবে না। আমাকে দেখে আর কাঁদে।

কাঁদে!

এবারে সত্যই সঞ্জীব বিস্মিত হইল।

কাঁদে বই কি হুজুর। জন্তু জানোয়ারেও কাঁদে। মানুষে মায়া-কান্না কাঁদতে পারে, ওদের চোখের জল মিথ্যা বলে না।

তারপরে আবার সুরু করিল—কাছিমদ ছেড়ে আসবার সময় মুন্সী আর সুরকির সে কি কান্না। একদিন লুকিয়ে গিয়েছিলাম, দেখলাম সুরকি তেমনিভাবে বাড়ী আগলে ব'সে আছে। আমাকে দেখে ওর কি আনন্দ। পাছে আবার চলে আসি আমাকে আর ছাড়তে চায় না।

আমি কাল যখন গিয়েছিলাম, সুরকিকে দেখলাম।

দেখলেন হুজুর! তবে।

কারখানায় আসবার সময়ে ঐ মাগী বল্‌ল, চলো নীলমণিকে নিয়ে চলো। মনটা খুশী হ'ল, ভাবলাম, তবে নীলমণির উপরে মায়া পড়েছে। আ রাক্কুসী তার মনে কি এই ছিলো।

কি হ'ল?

একদিন বড় সাহেবের চাপরাশি এসে নীলমণিকে নিয়ে যায় আর কি!

আমি বললাম, ও কি করো?

সে বল্‌ল, কেন তোমার বউ গিয়ে ওটা বড় সাহেবকে কবুল ক'রে এসেছে।

আমি বলি, সে কি?

এমন সময়ে রাক্কুসী কোত্থেকে ঝড়ের মতো এসে বলে—দাও ছেড়ে দাও, ওটা বড় সাহেবকে আমি দান করেছি।

সঞ্জীব বুঝিল রূপোর ঝুমকো ও চুড়ির কথা ইন্দু লুকাইয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ পতিমনস্তত্ত্বজ্ঞানের বলে পত্নী বুঝিয়াছিল দান পর্য্যন্ত সহ্য হইবে, বিনিময় বা বিক্রয় সহ্য হইবে না।

আমি বলি, তোর জিনিষ যে তুই দান করেছিস্? তোর ছেলে হ'লে তাকে দান করিস্।

কি করবো হুজুর! বড় সাহেবের চাপরাশি যে শিকল ধ'রে টানতে লাগলো। কিন্তু নীলমণি যাবে কেন? ওকে কামড়াতে যায়। তখন রাক্ষুসী বলে কি জানেন! বড় সাহেবের চাপরাশির গায়ে ও যদি আঁচড় কামড় দেয়, তবে আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

তারপরে বলে, যাও তুমি গিয়ে ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

আমি পাথর হুজুর, আমি পাথর! আমি নিজের হাতে বুকের ধনকে পরের ঘরে পৌঁছে দিলাম, বনের জানোয়ারকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে দিলাম। আমি পাথর নই তো পাথর কে?

এই বলিয়া সে কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল, হুজুর তো ওকে ভালবাসতেন, একবার দেখতে যাবেন ওকে?

সঞ্জীব উৎসাহের সঙ্গে বলিল, চলো না। কিন্তু এখন যে রাত হ'য়ে গেল।

আমি তো রাতের বেলাতেই যাই।

তুমিও ওকে দেখ্‌তে যাও নাকি?

মাঝে মাঝে যাই।

তোমার স্ত্রী জানে?

জানবে কি ক'রে? লুকিয়ে যাই যে, বলিয়া লজ্জায় হাসিয়া ফেলিল।

চাপরাশি যদি বলে দেয়।

আমি জল ব'য়ে দিই, কয়লা ব'য়ে দিই, বলতে যাবে কে? চলুন হুজুর।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মুরলী পথের পাশ হইতে আগাছা তুলিতে লাগিল।

ও কি হবে?

ওকে খেতে দেবো।

ঐ আগাছা খাবে?

তবে শুধু হাতে যাবো?

কিছু তরকারি নিলে পারতে।

পয়সা কোথায়? বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিল।

এত রোজগার করো আর—

রোজগারই করি, আর কিছু নয়। হপ্তার দিন আফিসে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে, তখনি হাতে তুলে দিতে হয়। কত পাই তাও ভালো ক'রে জানিনে।

ধরো কখনো যদি একটু তাড়িটাড়ি খেতে ইচ্ছে হয়।

সে পয়সা ও দেয়।

সঞ্জীব ভাবিল, তাড়ির পয়সা সাধ্বী স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বহস্তে স্বামীর হাতে তুলিয়া দেয়, কিন্তু নীলমণিকে দু'পয়সার তরকারি খাওয়ানো বাজে খরচ।

আচ্ছা চলো আমি তরকারি কিনে দেবো।

দু'জনে চলিতে লাগিল।

হুজুর ওর সামনে যা বলেছি সব মিথ্যা। আরামে আছি, ভালো আছি, সব মিথ্যা। কিন্তু অন্য রকম বল্‌লে কি আর রক্ষা থাকতো।

একটু থামিয়া আবার সুরু করিল—তাছাড়া নীলমণির নাম মুখে আনবার উপায় নাই। বুকটা যখন নীলমণির জন্যে পুড়ে যাচ্ছে তখনো মুখে হাসতে হবে। না জানি কি পাপ ক'রেছিলাম। কেন মাটি খেয়ে ওকে ঘরে আনতে গিয়েছিলাম, আমার সুখের সংসার ভেঙে গেল।

সম্মুখেই বাজার। একটি দোকান হইতে কিছু আলু, শাঁখ-আলু ও কলা কিনিয়া লইয়া তাহারা আবার অগ্রসর হইল।

কারখানার প্রান্তে নদীর ধারে একটি টিলার উপরে শালবনের মধ্যে বড় সাহেবের বাংলো। বাংলোর পিছন দিকে হেড চাপরাশি বাদলের কোয়ার্টার। মুরলী সঞ্জীবকে লইয়া বাদলের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল, ডাকিয়া বলিল, বাদল দাদা একটা লণ্ঠন দাও।

বাদল বাহিরে আসিয়া বলিল, কে মুরলী? নীলমণিকে দেখ্‌তে এসেছ? পশুটা আজ সারাদিন কিছু খায়নি, যাও দেখে এস, বলিয়া তাহার হাতে একটি লণ্ঠন দিল।

ঘরের মধ্যে হইতে একটি নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, অমনি দেখলেই হয় না। কয়েক বাঁক জল এনে দিও, ঘরে জল বল্‌তে নেই।

মুরলীর স্নেহের উপরে এই দাবীটা নিতান্ত জুলুমের মতো সঞ্জীবের কানে লাগিল।

নারীর দয়ামায়া কূপের মতো গভীর কিন্তু সঙ্কীর্ণ, ঘরের চাহিদার বেশী মিটাইতে পারে না। পুরুষের হৃদয় পাহাড়ী নদীর মতো বন্যাপ্রবণ, উদার এবং উদ্দাম।

লণ্ঠন লইয়া মুরলী চলিল, পিছনে সঞ্জীব। কাছেই একটি বড় কাঠের খাঁচা, একটা দিক লোহার শিক আঁটা। লণ্ঠনের

আলোয় সঞ্জীব দেখিতে পাইল খাঁচার এক কোণে বাড়ীর বুড়োটি যেন কম্বল গায়ে দিয়া জড়ো সড়ো হইয়া বসিয়া আছে,—নীলমণি। চেনা পায়ের শব্দে নীলমণি উঠিয়া আসিয়া শিকের কাছে দাঁড়াইল, আর দুটি শিকের ফাঁকে মুখ চালাইয়া দিয়া বাহিরে আসিবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রভুকে জানাইতে চাহিল—আমার কি দশা দেখো, বাহিরে আসিতে পারিলে তোমার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া মনের খেদ মিটাইতাম।

মুরলী বলিল, হুজুর দেখেছেন আমার নীলমণি কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছে। দেখবেন ও আর বেশি দিন বাঁচবে না।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল, হয় মরবে নয় কোন দিন খাঁচা ভেঙে পালাবে।

সঞ্জীব বলিল, দাও, ওকে খেতে দাও।

মুরলী একটা কলা তার মুখের সম্মুখে ধরিল। নীলমণি দাঁত দিয়া সেটা ধরিয়া টানিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিল। মুরলী আলুগুলা খাঁচার মধ্যে ফেলিয়া দিল। নীলমণি বহুদিনের বুভুক্ষুর মতো একটার পরে একটা সেগুলি গলাধঃকরণ করিল।

মুরলী বলিল, সারাদিন কিছু খায়নি। তারপরে নিজের মনেই বলিয়া চলিল, খাবে কি। একে তো ওর খাওয়ার বাছ বিচার আছে, অন্য ভালুকের মতো যা তা খায় না, তার উপরে আবার আমার হাতে খাওয়া অভ্যাস। না খেয়ে খেয়ে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে আহার সমাধা করিয়া নীলমণি শিকের কাছে আসিয়া বসিল। মুরলী হাত ঢুকাইয়া দিয়া তাহার লোমের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল।

আহা-হা, লোমগুলোয় একেবারে জট পাকিয়ে গিয়েছে, না পড়েছে একটু গেরি মাটি না পড়েছে কাঁকই।

তারপরে সঞ্জীবের দিকে তাকাইয়া বলিল, আগে তো ওকে দেখেছেন হুজুর, কেমন জৌলুস ছিল, আর এখন কেমন লক্ষ্মীছাড়ার দশা।

সত্যি মুরলী, ওর গলায় কড়ির মালাটা না থাকলে ওকে নীলমণি বলে চিনতেই পারতাম না।

তবে হুজুর, বলিয়া সে সঞ্জীবের দিকে তাকাইল।

হুজুর, একদিন বড় সাহেবের পায়ে কেঁদে পড়বো, বলবো আমার নীলমণি আমাকে দাও।

ইন্দুর হাতের চুড়িগুলা ও কানের দুলের কথা সঞ্জীবের মনে পড়িল।

সে বলিল, তার চেয়ে ওকে দেখাশোনা করবার ভার চেয়ে নাও।

তা হবার নয় হুজুর, তা হলে বিনা পয়সায় জল তুলে দেবে কে? বলিয়া বাদলের কুটিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

তা ছাড়া ঘরে যে রাক্ষুসী আছে, নীলমণি ওর দু'চক্ষের বিষ।

সঞ্জীব বুঝিল বৈশাখ মাসে বিলিতি কুকুর ছানা প্রাপ্তির আশা সম্বন্ধে মুরলী একেবারে অন্ধকারে আছে।

লণ্ঠনের আলোয় নীলমণির চোখ দুটা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল। পূরাতন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও আনন্দের ঐ দুটি শেষ নিদর্শন।

সঞ্জীব ওর মনের কথা অনুমান করিতে চেষ্টা করিল—ও কি ভাবিতেছে? সঞ্জীব ওর দৃষ্টিতে একটা সুদূর-প্রসারিতা লক্ষ্য করিল—ঐ চোখ যেন অনেক দূরের বন, অনেক দূরের নদী, অনেক

দূরের পাহাড়কে লক্ষ্য করিতেছে, যেখানে মহুয়া পলাশ শাল শিমুল, যেখানে ডালে ডালে ফুল ফল, পাতায় পাতায় উস্কুখুস্কু, যেখানে ঝরণার কানাকানি আর যেখানে উপত্যকার ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে চাঁদের আলোয় ভালুকের দলের সারা রাত ধরিয়া নাচানাচি। লোহার গরাদে দেওয়া কাঠের খাঁচায় বসিয়া নীলমণির চোখ যেন ক্ষণে ক্ষণে স্বর্গের আভাস দেখিতেছে।

অনেক রাত হল যে, কখন্ জল দেবে? পুষ্যিপুত্তুরকে না হয় আর একদিন এসে ভালো ক'রে রাজভোগ খাইয়ে যেও। বড় সাহেবের খানা তো ওর পছন্দ হবে না। যেমন রাজা তেমনি রাজপুত্তুর! আহা-হা। যাও এখন জল দাও গে।

নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

চলুন হুজুর। আজ আসি বাবা। আবার কাল দেখা হবে, বলিয়া তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিয়া মুরলী বলিল—হুজুর আপনি চলে যান, এই সিধে পথ, ভুল হবে না।

আচ্ছা আসি, বলিয়া সঞ্জীব রওনা হইল। একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লণ্ঠনের অপস্রিয়মাণ আলোয় তখনো নীলমণির চোখের উজ্জ্বল বিন্দু দুইটা দেখা যাইতেছে।

কিছু দূর অগ্রসর হইবার পরেও তাহার কানে আসিতে লাগিল কপিকলের আর্তনাদ! মুরলী জল তুলিতেছে—নীলমণিকে গোপনে দেখিবার উৎকোচ।

সংসারের বিচিত্র রীতির কথা ভাবিতে ভাবিতে সঞ্জীব পথ চলিতে লাগিল। মুরলীর দুঃখ স্মরণ করিয়া তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সংসারে এত রকমের দুঃখও আছে।

১৮

সঞ্জীব পথে বাহির হইয়া পড়িল। পিঠে একটা থলিতে খানকতক ধুতি, জামা, কিছু টুকিটাকি আর টাইম টেব্‌ল; হাতে একখানা পাকা লাঠি।

পাঁপড়ি শুধাইল, দাদাবাবু আবার ফিরবে কবে?

যখনি ভালো না লাগবে ফিরে আসবো।

এখানে ফিরবে না সোজা সেই কল্‌কাতা বলে' চলে যাবে?

নরসিংপুরের জল হাওয়ার জোর থাকে তো টেনে আনবে।

তা হলে এখানে ফিরতেই হবে।

তবে সেই কথাই রইলো, বলিয়া সোজা সে পশ্চিম মুখে রওনা হইয়া পড়িল।

তখনো রোদ কড়া হইয়া ওঠে নাই, রোদ মধুর ছায়া মধুরতর এমনি ভাব।

পিছনে মিষ্টি রোদ, সম্মুখে ধূসর পথ, ভিতরে বাহিরে বোঝা হাল্কা এমন অবস্থায় পথ চলিতে কি আনন্দ সে কেবল পথচারীই জানে। কিছু দিন হইতে সঞ্জীব কল্পনায় সেই সুখ অনুভব করিতেছিল, এবারে সত্য সত্যই পথে বাহির হইয়া পড়িল।

একাকী নরসিংপুরে তাহার ভালো লাগিতেছিল না। চেনা লোকের মধ্যে ঐ এক পাঁপড়ি, স্বভাবতই তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তার সীমা সঙ্কীর্ণ। আর ছিল ছায়ার স্মৃতি। সে স্মৃতি তো যেখানে

যাইবে সেখানেই থাকিবে সঞ্জীব ভাবিল। আর এক ক্ষীণ আশা ছিল ছায়া ফিরিতে পারে, সে আশা সফল হইবার কোন লক্ষণ নাই সে বুঝিল। কলিকাতায় ফিরিয়াই বা সে কি করিবে, সেখানেও অকারণে ঘুরিয়া বেড়ানো, তবে এখানেই বা নয় কেন? সে স্থির করিয়াছিল, রেল লাইন বরাবর পশ্চিম মুখে চলিতে থাকিবে, টাটানগর, চক্রধরপুর দেখা যাক্ কত দূর যাওয়া যায়। রেল লাইন বরাবর চলিবার সুবিধা এই যে ভালো না লাগিলে তখনি কোন এক ষ্টেশনে গাড়ী ধরিয়া ফিরিতে পারিবে।

পাঁপড়ি শুধাইয়াছিল, দাদাবাবু, খাবে কোথায়?

কেন, রেল ষ্টেশনে খাবার পাওয়া যাবে।

আর শোয়া?

সেও ঐ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অভাবে প্ল্যাটফরমে।

নিজের মনে মনে সে বলিল, ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে।

পশ্চিম মুখে যাত্রা করিবার আরও একটা সূক্ষ্ম কারণ তাহার মনের মধ্যে ছিল। পাঁপড়ির কাছে সে শুনিয়াছিল যে ছায়ারা ঐ পশ্চিমের গাড়ীতেই গিয়াছে। সঞ্জীবকে জেরা করিলে সে নিশ্চয় অস্বীকার করিত, বলিত পাগল নাকি, তাহারা কোথায় গিয়াছে ঠিক নাই, মরীচিকার পিছনে কে দৌড়ায়? কিন্তু মানুষের সব আশাই কি মানুষের গোচর? মরীচিকার পিছনে সত্যই যদি কেহ না দৌড়ায় তবে মরুভূমি কঙ্কালের মেখলা পরে কেন?

সম্মুখে একটি ছায়া নিক্ষেপ করিয়া সঞ্জীব চলিতে লাগিল। ডাইনে বনকাঠির পাহাড়। ঐ গিরিতরঙ্গ-রেখার পরপারে কোথাও আছে ধারাগিরি, যেখানে একদিন শাল গাছের ছায়ায় সে ও

ছায়া একাকী অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। ধারাগিরির সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাহার মনে পড়িল। বামে দূরে তামার কারখানার চিমনি-গুলা, ওখানে নীলমণিকে একবার দেখিবার মূল্যস্বরূপ মুরলী শীতের রাত্রে জল বহিয়া মরিতেছে। আরও দূরে সম্মুখে পাহাড়ের মাথায় যেখানে অট্টালিকার শুভ্র আভাস—ঐ গালুডি শহর। একদিন সে রেলে করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ভাবিয়াছিল আর একদিন ছায়াকে লইয়া যাইবে, অবশ্য কায়াকেও সঙ্গে লইতে হইবে। এমন সময়ে কোথায় কি ঘটিল, ছায়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। হাতীডোবার নালা পার হইয়া পথ আবার চড়াই, দু পাশে বেঁটে শালের গাছ, হয় তো দশ বিশ বছর পরে অরণ্যে পরিণত হইবে, কিংবা হয় তো এমনি থাকিয়া যাইবে, কতকাল এমন আছে কে বলিতে পারে। মাঠে মাঠে ধূসর পথের নিস্তব্ধ ওঠা-পড়া কোন্ খেয়ালের রাগিণীর মতো তান হইতে তানে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। কোথাও তেঁতুল বট অশ্বত্থ আমগাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম, কোথাও বা কেবলি ফাঁকা মাঠ, আর সর্ব্বত্রই মাঠের পারে অরণ্য, অরণ্যের পরে পাহাড়। কোথাও বাঁধের লাল মাটির খাতে স্বচ্ছজল, আবার কোথাও বা কালো কালো তামাটে পাথরের ছোট বড় পিণ্ড, দেবীযুদ্ধে নিহত অসুর-বাহিনীর মুণ্ড।

সঞ্জীবের ছায়া যখন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে পড়িল, ছায়া যখন ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল তখন সে রাখামাইন্স্ নামে এক ছোট রেল ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানেই সে রাত কাটাইবে।

পরদিন আবার পথ। পথে আবার সেই ভূদৃশ্য। যেন একই পুস্তকের একই কাহিনী-ছাপা পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছে। পুস্তক একই হোক, কাহিনী একই হোক কিন্তু রস তো পুরাতন হয় না। সঞ্জীবের চোখের ভোজের আর বিরাম নাই।

সকাল বেলায় রেলষ্টেশন ছাড়িবার আগে দুপুর বেলার জন্য সে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইত। দুপুর বেলায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে কোন পাহাড়ী নদীর ধারে কোন গাছের ছায়ায় বসিয়া আহার সারিয়া সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইত, তারপরে আবার পথে নামিয়া পড়িত।

সন্ধ্যাবেলায় সে টাটানগর রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। দুদিনে কুড়ি মাইলের বেশি আসিয়াছে। দুদিন পরে আজ সে পেট ভরিয়া খাইল এবং রাত্রিটা নিরুপদ্রবে ঘুমাইবার আশায় পরবর্ত্তী ষ্টেশনের একখানা টিকিট করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া পড়িল। দেহ যখন ক্লান্ত, মন যখন হাল্কা তখন ঘুম আসিতে বিলম্ব হয় না।

অনেক রাত্রে ট্রেনের গর্জ্জনে সঞ্জীবের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল ঘড়িতে তিনটা। অনেকগুলি যাত্রী বাক্স পেঁটরা লইয়া ঘরে ঢুকিল, সবগুলি আলো জ্বালাইয়া দিল, চা ফরমাস করিল। সঞ্জীব বুঝিল আর ঘুম হইবে না। সে শুইয়া শুইয়া গত দুই দিনের অভিজ্ঞতার রোমন্থন করিতে লাগিল।

বিষণের কথা মনে পড়িয়া তাহার হাসি পাইল। রাখামাইন্‌স্ রেলষ্টেশনে তাহার সঙ্গে দেখা। গালে প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্ন, একটা চক্ষু অন্ধ, একটা পা খোঁড়া বিষণ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং ছাপরাই হিন্দির সঙ্গে দু'চারটা বাংলা শব্দ ও সিংভূমী টান জুড়িয়া দিয়া ভিক্ষাপ্রার্থনা করিল।

সঞ্জীব তাহার হাতে চারিটি পয়সা দিয়া শুধাইল, তোমার নাম কি বাপু?

একটা চক্ষুর স্তিমিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—বিষণ।

তোমার গালে ওটা কি করে হ'ল?

পরমাত্মার কৃপায় হল হুজুর।

সঞ্জীব কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া শুধাইল, পরমাত্মার কৃপায়, সে আবার কি রকম! তখন বিষণ যে কাহিনীটি বলিল তাহা যেমন কৌতুকজনক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এখন শুইয়া শুইয়া সঞ্জীব সেটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

বিষণ বলিয়াছিল যে এক সময়ে গালুডিতে তাহার একটি ছোট পান বিড়ির দোকান ছিল কিন্তু তাহাতে একটা পেটও চলিত না, দেশে কি আর পাঠাইবে। সে নিত্য নিয়ত পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করিত। একদিন যখন সে বন হইতে কাঠ কুড়াইয়া ফিরিতেছে এমন সময়ে একটা বনের 'ভল্লু' সমুখে উপস্থিত হইল, বিষণ কাঠের বোঝা ফেলিয়া দিয়া পালাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু পালাইতে পারিবে কেন? কারণ পরমাত্মা যে বনের ভল্লুরূপে উপস্থিত! অবশ্য তখনি সে বোঝে নাই, পরে বুঝিয়াছে আর সে জন্য সে পরমাত্মার কাছে অশেষ ঋণী। সেই ভল্লুরূপী পরমাত্মা তাহাকে জখম করিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। ছয়মাস শয্যাশায়ী থাকিবার পরে যখন সে উঠিল তখন তাহার গালে প্রকাণ্ড ক্ষত-চিহ্ন, একটি পা খোঁড়া, একটি চক্ষু অন্ধ, আর দোকানটি লুপ্ত। এতক্ষণে পরমাত্মার কৃপা সে অনুভব করিল। সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। এখন তাহার অবস্থা দেখিয়া ও কাহিনী শুনিয়া

লোকে তাহাকে এত বেশি ভিক্ষা দেয় যে তাহার পেট তো স্বচ্ছন্দে চলেই, দেশেও কিছু কিছু পাঠাইতে সক্ষম হয়।

কাহিনী শেষ করিয়া বিষণ কপালে হাত ঠেকাইল বোধকরি সেই ভল্লুরূপী পরমাত্মার উদ্দেশেই।

কাহিনীটি সঞ্জীব অনেকবার স্মরণ করিয়াছে, এখন আবার তাহার মনে পড়িল। তাহার আর একটি ভল্লুর কথা মনে পড়িল। নীলমণির কথা। সে ভাবিল, বোধ করি সে ক্ষেত্রেও পরমাত্মা ভল্লুরূপে মুরলীর গৃহে আসিয়াছেন ; না জানি সেখানে শেষ পর্য্যন্ত কি লীলা তিনি অবলম্বন করিবেন।

এক পেয়ালা চা ফরমাস করিয়া সঞ্জীব উঠিয়া পড়িল। ভোর হইলে কিছু খাইয়া, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এবারে পথের ডান দিকের পাহাড়গুলা উচ্চতর, তাহাদের মূর্ত্তি অধিকতর রুদ্র। সে পথ চলে আর পাহাড়গুলার দিকে তাকায়। পথের মোড় বদলে পাহাড়গুলার চেহারা বদলায়—একই পাহাড় নূতন নূতন অভাবিত মূর্ত্তি ধরে। আর রৌদ্রছায়ার চকিত প্রলেপে কত যে রঙের খেলা, সঞ্জীবের চোখ কৃতার্থ হইয়া যায়। সে দেখে পাহাড়ের কোথাও ঘন কালো, কোথাও ফিকে কালো, কোথাও শ্যাম, কোথাও সবুজ, কোথাও স্বচ্ছ! আবার হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত পাহাড়টা সুবৃহৎ একটি কৌস্তুভ মণির মতো ঝলমল করিতেছে, চোখ ঠিকরিয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে রঙের কত আভা, কত আভাস, ছায়াতপের কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুষমা। তাহার আক্ষেপ হয়, আহা এগুলি ধরিয়া

রাখা যায় না! কখনো তাহার মনে হয় পথিকের শ্রম ভুলাইয়া দিবার জন্যই এত আঁয়োজন।

আবার মনের মধ্যে তাকাইয়া দেখে, কত সৌন্দর্য্য, কত সুষমা, কত বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য অভিনব খেলা। এক ছায়া সেখানে শতমূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিতেছে।

ছায়ার কথাগুলি তাহার মনে পড়ে, তাহার স্মৃতিগুলি মনে জাগে। সঞ্জীবের প্রতিষ্ঠাভূমির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেগুলিও নূতন নূতন মূর্ত্তি ধরে। আবার স্মৃতির চেয়েও তাহাকে বেশি আকর্ষণ করে যাহা ঘটিতে পারিত। সেই হইলে-হইতে-পারিত'র দোলনায় চাপাইয়া ছায়াকে সে দোলা দিতে থাকে, তালে তালে শাখার ফুল, খোঁপার কুঁড়ি, চূর্ণ অলক ও স্মিত হাসি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে। সে ভাবে যাহাকে আমরা ভালোবাসি তাহাকে কতটুকুই বা জানি! মনে মনে তাহাকে সৃষ্টি করিয়া লইয়া পূর্ণতা দিই; বিচ্ছেদ সেই সৃষ্টির অবসর দেয় বলিয়াই তাহা শূন্যতা নয়, নিরর্থক নয়। তাহার মনে হইল ছায়ার বিচ্ছেদটি না ঘটিলে সে আজও তাহার কাছে এতটুকু হইয়া থাকিত। আর আজ এই বিচ্ছেদের উদার অবকাশে ছায়া আকাশব্যাপিনী মূর্ত্তি ধরিয়াছে। গিরিরেখার ঐ কোমল রঙ্গিমায় ছায়ার রমণীয় গ্রীবাভঙ্গী, অরণ্যের ঐ নীলাভ সবুজে ছায়ার অঞ্চলপ্রান্ত, পলাশ বনের ঐ একটানা রক্তিমায় ছায়ার শাড়ীখানার রক্তাভ পাড়, আর পাহাড়ী ঝর্ণার ঐ স্বগত কল্‌কলে ছায়ার মনের চাপা কথা যেন আলোকে পুলকে বেদনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ একখানা ট্রেন প্রচুর ধূম ও প্রচুরতর শব্দ হানিয়া চলিয়া যায়, রাখাল ছেলেরা পাচনি তুলিয়া যাত্রীদের শাসায়, জানালা

দিয়া একজন একলোটা জল নিক্ষেপ করে, এঞ্জিন কর্কশ বাঁশী বাজায়, সঞ্জীব মুহূর্তে ভাবলোক হইতে বাস্তবে নামিয়া আসে। গাড়ীখানা বিন্দুবৎ হইয়া মিলাইয়া গেলেও সেই দিকে তাকাইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। তারপরে আবার দ্রুত চলে।

গাড়ী দেখিয়া তাহার এক দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সঞ্জীব ছায়াকে বলিয়াছিল—আমার খুব গাড়ী চড়তে ইচ্ছা করে।

ছায়া শুধাইয়াছিল, কেন?

কেন নয়, শখ। শীতকালের রাতের গাড়ী, সেকেণ্ড ক্লাস কামরা, নামবার তাড়া থাকবে না, আর পাশে থাকবে—

টিফিন বাস্কেট।

সঞ্জীব বলে, না, তুমি আর সঙ্গে থাকবে টিফিন বাস্কেট।

আর কায়া?

সঞ্জীব কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলে, টিফিন বাস্কেটও থাকবে, আবার কায়াও থাকবে।

তা হলে আপত্তি নেই।

সঞ্জীব আবার বাস্তবে ফিরিয়া আসে, ভাবে ওরা কোথায় গিয়াছে! ভাবে হঠাৎ দেখা হইয়া যায় না, খুব মজা হয়। হইলে-হইতে-পারে'র দোলায় ছায়াকে সে চাপাইয়া দেয়।

চলো না কয়েক দিনের জন্য ঐ পাহাড়গুলোয় ঘুরে আসি।

ছায়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, একেবারে কয়েকদিনের জন্যে?

ক্ষতি কি?

মনে করুন একটা ভালুক বের হ'ল।

সঞ্জীব মনে মনে বলে, অতর্কিতভাবে কায়ার বের হওয়ার চেয়ে বোধকরি ভালুক বের হওয়া ভালো—

মুখে বলে—ভালুককে ভয় কি! নীলমণিও তো ভালুক।

সব ভালুক কি তেমন শান্ত সুবোধ?

নিতান্তই অশিষ্ট ভালুক যদি আসে গাছে চড়বে।

আর আপনি মই টান দেন।

ছায়া হাসিয়া ওঠে, তাহার দুই গালে ছোট দুটি টোল পড়ে, রূপসাগরের ঘূর্ণি। ওখানে কতবার সঞ্জীবের নৌকা বানচাল হইয়া গিয়াছে।

মহিলামারুপ, সিনি, রাজখারসোঁয়া আরও কত ষ্টেশন পার হইয়া সঞ্জীব চলিতে থাকে।

এবারে পাহাড় ও অরণ্য দুইদিক হইতে চাপিয়া কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝখানে রেল লাইন, পাশে পায়েচলা পথ, তার পরেই বন, কয়েক শত গজ দূরেই পাহাড়; কোথাও বা ডানে বাঁয়ে গভীর উপত্যকা, উপত্যকায় ঘন বন, গায়ে গায়ে বনস্পতি; কোনখানে বা দুই একটা পাহাড়ী নদী, উপত্যকার কোন কোন স্থানে দু'চারটি আদিবাসীর কুটীর।

সঞ্জীব অনেকদিন ভাবিয়াছে প্রকৃতিকে মানুষের এত ভালো লাগে কেন? পাহাড় পর্ব্বত, অরণ্য প্রান্তর তো ভোগের বস্তু নয়, তবে মানুষের চোখে সে সব এমন সুন্দর কেন? কেবলি রেখার ও রঙের মোহময় আকর্ষণের জন্য? কিন্তু তবু তো সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় না। রেখা ও রঙ মোহ সৃষ্টি করে কেন? এবারে বোধ করি একটা উত্তর সে পাইয়াছে। ঐ রেখা ও রঙ মানুষের চোখে, মানুষের মনে প্রিয়জনের আভাস আনিয়া দেয়—তাই মানুষের

চোখে এমন সুন্দর, এমন রমণীয়। পাহাড়ের উচ্ছ্রিত গৌরব, গিরিমালার উচ্চাবচ কমনীয় বঙ্কিমা, দিগন্তের ক্রমঃসূক্ষ্ম ভ্রূ-বিন্যাস, অরণ্যের রহস্যময় প্রসারিত অঞ্চল, আকাশের শুভ্র সুকুমার কপোল, ঝরণার গদ্‌গদ্‌ স্বগতোক্তি, উষার লজ্জারুণ আভা, সন্ধ্যার রক্তিম বিষাদ, পুষ্পের পেলব চিক্কণতা, সমস্ত, সমস্তই নারী-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভাসে মণ্ডিত। তাই পুরুষ যখন নারীকে আলিঙ্গন করে সে এমনভাবে বিশ্বমহিমাকে অনুভব করে, তাই কবি যখন প্রকৃতিকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়, প্রিয়াকে তাহার মনে পড়িয়া যায়। সঞ্জীবের মনে পড়িল একদিন ছায়ার চোখ দেখিয়া তাহার মন বলিয়া উঠিয়াছিল—"তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্ব্বত।" আর আজ অরণ্য পর্ব্বত তাহার কাছে ছায়াময়। ছায়ার কথা সচেতনভাবে তার মনে উঠিতেই তার মন বলিয়া ওঠে, এই পশ্চিমের দিকেই কোথাও সে গিয়াছে, সঞ্জীব আবার দ্রুত চলিতে সুরু করে। তাহার মন বলে পথ যদি এমন মধুর, মানুষে তবে ঘর বাঁধে কেন?

অবশেষে চারদিনের মাথায় সে টাটানগর হইতে চক্রধরপুরে আসিয়া পৌঁছায়। সে ভাবে একটা গোটা দিন রাত এখানে বিশ্রাম করিয়া লইবে, এ কয়দিনে বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে সে।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিল দেহ তখনো ক্লান্ত। ওয়েটিং রুমের বাহিরে আসিয়া দেখিল পশ্চিম আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, বিকালের দিকে ঝোড়ো বাতাস ও অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সঞ্জীব বুঝিল দেহের ও আব্‌হাওয়ার এমনতরো অস্বাভাবিক অবস্থায় একাকী পদব্রজে পথ চলা উচিত হইবে না। সে স্থির

করিল নরসিংপুরে ফিরিবে ; ভিতরে ভিতরে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

নরসিংপুরের একখানা ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিয়া রাত্রির কলিকাতাগামী গাড়ীতে সে উঠিয়া বসিল।

১৯

বোমার ভয়ে আলোর অর্দ্ধ নিমীলিত জ্যোতি। সেই খোলা আলোয় সঞ্জীব দেখিল কামরায় চারখানি বেঞ্চির দুইখানি অধিকার করিয়া জন তিনচার লোক আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রিত। আর একখানি বেঞ্চিতে একটি মেয়ে একখানি গরম চাদর গায়ে দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে ; তাহার একখানি হাতের মণিবন্ধে কয়েকখানি চুড়ি ও আঙুল কয়টি দেখা যাইতেছে আর দেখা যাইতেছে তাহার গালের উপরে একগুচ্ছ অলক।

সঞ্জীব পাশের বেঞ্চিখানিতে বসিল। কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িবার আগে পাশের বেঞ্চিতে শয়ান মেয়েটির দিকে একবার সে তাকাইল, তাহার শয়নের ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিমাটি সঞ্জীবের বড় মনোরম ঠেকিল। কেন জানি তাহার ছায়ার কথা মনে পড়িয়া গিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বেশ শীত করিতেছিল, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া সে ছায়ার কথা ভাবিতে লাগিল। যেখানে যত নারীর সৌন্দর্য্য আছে সব মিলিত হইয়াছে ছায়ার অপরূপ সৌন্দর্য্যে, তাই বুঝি কোথাও সুন্দরী নারী দেখিলে অমনি ছায়াকে মনে পড়িয়া যায়। একি

সুখ না অভিশাপ। এমন কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িল।

এটা কোন্ ষ্টেশন—বলিয়া পাশের বেঞ্চিতে ছায়া উঠিয়া বসিল। একবার জানলার কাঁচের উপরে মুখ রাখিয়া বাহিরের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করিল, তারপরে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বেঞ্চির কোণায় ঠেস দিয়া বসিল, অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছে এখন আর তাহার ঘুম আসিবে না। সেই স্তিমিত আলোয় বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

তাহার মনে পড়িল একদিন জীবনের একটি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরে ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছিল। আজ অন্ধকারে বাহিরের দৃশ্য সে দেখিতে পারিতেছে না। সেদিন দেখিতে পারে নাই চোখের জলের ঝাপসা বাধায়। গাড়ীভরা যাত্রী ছিল, তাই চোখের জল ফেলিতে পারে নাই, ফেলিতে পারিলে বোধ করি দৃষ্টি ফিরিয়া পাইত। প্রাণপণ সংযমে চোখের জল চোখে আটকাইয়া রাখিতে গিয়া কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি হইয়াছিল। সেদিনও সে এমনিভাবে এক কোণে ঠেস দিয়া এক আসনে কলিকাতা গিয়া পৌঁছিয়াছিল। মাঝপথে একটি সমবয়স্কা সহযাত্রিণী তাহাকে আলাপের মধ্যে টানিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ছায়া ধরা দেয় নাই। হাঁ, না বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার বুকের মধ্যে একটা ক্ষোভ ঠেলা দিয়া দিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই, ক্ষোভ কেন, কাহার বিরুদ্ধেই বা ক্ষোভ? অবশেষে আর কাহাকেও লক্ষ্যস্থলে না দেখিয়া সঞ্জীবের উপরে সমস্ত দোষারোপ করিয়াছিল। সে স্থির করিল তাহাকে অপ্রস্তুত করিবার অপরাধ সঞ্জীববাবুর। কি দোষ বিচার করিল না, বিচার করিতে অগ্রসর

হইলেও দোষ খুঁজিয়া পাইত না। কিন্তু তখন কি তাহার বিচার করিবার মতো মনের অবস্থা! মনে মনে সে সঞ্জীবকে দণ্ডিত করিতে লাগিল। সঞ্জীবকে কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়া সে যে বিদায় লইয়াছে সেটা সমর্থনযোগ্য মনে হইল, মনে হইল ইহাই উচিত দণ্ড। আগে দণ্ড, পরে বিচার বোধকরি ইহাই প্রেমের বিচিত্র রীতি।

বহরমপুর যাইবার পথে সে কয়েক দিন কলিকাতায় ছিল। সারদাবাবুদের বাড়ীর ঠিকানা সে জানিত। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে সে গেল। বাড়ী বন্ধ। ছায়া ভাবিল, যাক্ ভালোই হইল, ভদ্রতাও করা হইল অথচ দীর্ঘকালব্যাপী মামুলী আলাপের হাত হইতেও বাঁচা গেল। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিল। কিন্তু সেই স্বস্তির সঙ্গে আশাভঙ্গের একটি ছোট কাঁটাও যেন খুচ করিয়া বিঁধিল। তাহার মনের মধ্য হইতে কে যেন বলিল, তুমি কি শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই আসিয়াছিলে, আর তুমি কি সত্যই আশা করিয়াছিলে যে দু'দিন না যাইতেই বোমা-ভীরু সারদাবাবু বাসা তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবেন?

বহরমপুরে পৌঁছিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সঞ্জীবকে ছোট একখানি চিঠি লিখিয়া ফেলিল কিন্তু ঠিকানা দিল না। তারপরে প্রত্যেক দিন ডাকের সময়ে আশঙ্কা করিত, আশা করিত সঞ্জীবের চিঠি আসিবে। চিঠি আসিল না। প্রথমে ভাবিল তিনি রাগ করিয়াছেন তাই চিঠি লেখেন না। সে নিজেই যে ঠিকানা দেয় নাই একথা মনে পড়িলে ভাবিত, কেন তিনি কি ঠিকানাটা জোগাড় করিতে পারেন না। সে সিদ্ধান্ত করিল সঞ্জীববাবু ইচ্ছা করিয়াই চিঠি লিখিতেছেন না, তখন সে সঞ্জীববাবুর উপরে আবার রাগ করিল।

এমন সময়ে মায়ের পীড়া কঠিন হইয়াছে চিঠি পাইয়া সে নরসিংপুরে চলিয়া আসিল। মনে ভয় ছিল সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা হইবে। সঞ্জীববাবুরা সকলে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহার ভয় দুর হইল। কিন্তু আনন্দ তো হইল না, কেমন যেন আশাভঙ্গের ভাব হইল।

নরসিংপুর ত্যাগের আগের দিন ছায়া সারদাবাবুদের বাসায় বেড়াইতে গেল।

পাঁপড়ি বলিল—এই বড় ঘরটায় বসবে এসো দিদিমণি।

ছায়া বলিল, নারে। এই ঘরটাই ভাঁলো, বলিয়া সঞ্জীবের শয়ন-কক্ষে গিয়া বসিল।

পাঁপড়ি হাসিয়া বলিল—তোমাদের দু'জন ছাড়া আর কারো এ ঘরটা ভালো লাগে না।

অপরজন কে বুঝিতে পারিলেও শুধাইল, আর কে?

কেন, দাদাবাবু! কর্ত্তা কতবার বলতেন, মাষ্টার মশাই ও ঘরটা ছাড়ুন। তা দাদাবাবু কিছুতেই ছাড়বেন না।

অদ্ভুত পছন্দের সূত্রে দুজনকে জড়িত শুনিয়া ছায়ার বড় ভালো লাগিল।

তারপরে ভবানী দেবীর মৃত্যু হইল। সব ওলটপালট হইয়া গেল। পরম দুঃখের সময়ে এক একবার সঞ্জীবের কথা তাহার মনে পড়িত, ছায়া ভাবিত, সঞ্জীববাবু থাকিলে বোধকরি এতটা দুঃখ বোধ হইত না; ভাবিত তাঁহার কাছে গিয়া বসিলে বোধকরি চোখের জল অবাধে ঝরিত, বুক হাল্কা হইয়া যাইত; অসম্ভবের বদ্ধমুষ্টি খুলিবার চেষ্টা করিয়া ভাবিত, আহা এই সময়ে যদি তিনি আসিয়া পড়েন, বেশ হয়, আমার দায় লঘু হইয়া যায়।

সত্যই ছায়ার দায় বড় কম নয়। অধীর পিতা ও উন্মত্তপ্রায় কায়াকে সামলাইয়া রাখা সহজ নয়। অবশেষে ছায়াই নিজের দায়িত্বে স্থির করিল অবিলম্বে নরসিংপুর ত্যাগ করিতে হইবে। সম্বলপুরে তাহার কাকা থাকিতেন, পিতা ও ভগ্নীকে লইয়া ছায়া সেখানে রওনা হইয়া গেল।

সম্বলপুরে থাকিতে কয়েক দিন আগে সে সংবাদ পাইল যে কলেজ খুলিয়াছে। ইতিমধ্যে তারিণীবাবু ও কায়া অনেকটা শান্ত হইয়াছে, তাই সে কলিকাতায় রওনা হইয়াছে।

রাত্রিশেষের শীতে, নিঃশব্দ সঙ্গীহীনতায়, চলমান প্রায়ান্ধকার কামরায় একাকী বসিয়া বসিয়া ছায়ার মন একটি পরম স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জলের ঢেউ যেমন চাঁদের ছায়াটিকে মৃদুমন্দ দোলাইতে থাকে, তেমনি ভাবে সেই ব্যাকুলতাটিকে মনের মধ্যে সে দোলা দিতে থাকিল। এ ব্যাকুলতা সঞ্জীবের জন্য ছায়ার, এমন বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না, চিরন্তন পুরুষের জন্য চিরন্তনী নারীর এই ব্যাকুলতা।

সঞ্জীবের সঙ্গে আবার কি কখনো দেখা হইবে? তিনিও তো কলিকাতায় থাকেন, সে-ও তো কলিকাতায় থাকিবে। দেখা না হইবার কি কারণ? কিন্তু দেখা হইলেই বা কি? যদি সঞ্জীবের অন্তরের দীপ নিভিয়া গিয়া থাকে? দীপ যে সত্যই জ্বলিয়াছিল তাহারও তো প্রমাণ নাই, আছে ছায়ার অনুমান মাত্র। সে শুনিয়া ছিল এসব বিষয়ে মেয়েদের অনুমান মিথ্যা হয় না। কিন্তু সেটাও তো শোনা কথা। যাহোক্, একবার দেখা হইলেই আসল রহস্য প্রকাশ পাইবে। কিন্তু নিষ্ফলতার আঘাত কি ছায়া সহ্য করিতে পারিবে? না, না, এমন সংশয়ের ক্ষেত্রে দেখা না হওয়াই ভালো।

কিন্তু তখনি আবার মনের অন্য এক কোণা হইতে কে বলিয়া ওঠে, দেখা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্যর্থতা? অসাড় স্বস্তির চেয়ে দুঃখময় সংঘাত যে অনেক ভালো। 'অনেক ভালো', 'অনেক ভালো' ছায়া বারংবার মনে মনে জপিতে লাগিল 'অনেক ভালো', 'অনেক ভালো।' ভালোবাসায় সুখ নাই সত্য, কিন্তু ভালো না বাসিয়াই কি আনন্দ আছে!

পরম দুঃখে যে ছায়ার চোখে জল পড়ে না, আজ অকারণে তাহার চোখে অঝোরে জল পড়িতে লাগিল। নিজের চোখে যে এত জল ছিল, এই তথ্যটা ছায়াকে বিস্মিত করিয়া দিল। মুখ ধুইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ছায়া গাড়ীর বাথরুমে প্রবেশ করিল।

পাশের বেঞ্চিতে সঞ্জীব উঠিয়া বসিল, শীতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে।

ছায়া বাথরুম হইতে বাহির হইয়া স্বস্থানে বসিল, কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করিল না। এমন সময়ে কোন্ একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, এক পেয়ালা চায়ের উদ্দেশ্যে সঞ্জীব উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাস হইল, পর মুহূর্ত্তেই বিস্মিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—ছায়া যে!

ছায়া এই প্রথম তাহাকে লক্ষ্য করিল, তাহার বিস্ময় ও আনন্দও কম নয়, সে শুধু বলিল—আপনি!

ছায়া বুঝিল সংসারে অসম্ভবের বদ্ধমুষ্টি মাঝে মাঝে খুলিয়া যায়।

সঞ্জীব বুঝিল স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেদ মানুষের একটা অলীক সংস্কারমাত্র, এতক্ষণ সে ছায়াকে স্বপ্নে দেখিতেছিল।

তুমি কোথা থেকে?

আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

দাঁড়াও সব বলবো, আগে দুই পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করি।

দুই পেয়ালা চা লইয়া দুইজনে মুখোমুখী বসিল।

চা-পান ও গল্প দুটো কাজ এক সঙ্গে মুখ স্বচ্ছন্দে করিতে পারে না। তাই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া গেলে চা-অলার কাতর অনুনয়ে তাহারা যখন পেয়ালা ফেরৎ দিল পেয়ালার আধেয় প্রায় সবটাই রহিয়া গিয়াছে।

পয়সা দিতে দিতে সঞ্জীব বলিল, চা-গুলো ফেলে দিও, আর একজনকে ঐ চা-টাই চালিয়ে দিওনা বাপু।

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে।

ছায়া কোত্থেকে আসছ ?

সম্বলপুর থেকে।

ও, তাই বুঝি পাঁপড়ি বলেছিল তোমরা পশ্চিমের গাড়ীতে গিয়েছ।

আপনি কি ক'রে জানলেন ? আপনি কি এর মধ্যে আবার নরসিংপুরে এসেছিলেন নাকি ?

তাহার অন্তর পুলকিত হইয়া ওঠে।

না হ'লে কি ক'রে জানবো ?

কিন্তু হঠাৎ আসতে গেলেন কেন ?

ছায়া উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করে।

কল্‌কাতায় একা একা ভালো লাগলো না, চলে এলাম। তা ছাড়া ভাবলাম তোমার যদি দেখা মেলে।

ছায়ার মুখ রাঙা হইয়া ওঠে। সে ভাবে ভাগ্যে অন্ধকার নহিলে ধরা পড়িতে হইত।

তাহলে সব খবর তো শুনেছেন।

শুনেছি বইকি।

কায়া নিশ্চয় খুব অধীর হ'য়ে পড়েছিল ?

খুব।

আর তোমার বাবাও বোধ হয় ভেঙে পড়েছেন ?

একেবারে। এতখানি ভেঙে পড়বেন ভাবি নি।

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল।

কই আমার কথা তো জিজ্ঞাসা করলেন না ?

তোমাকে কি চিনি না, ছায়া! আঘাত তোমার কারো চেয়ে কম লাগেনি, কিন্তু তুমি তো ভেঙে পড়বার মেয়ে নও।

ছায়ার চরিত্রের রহস্য সঞ্জীব কেমন করিয়া বুঝিল ভাবিয়া ছায়ার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, সে আনন্দময় গৌরব অনুভব করে।

ভেবেছিলাম আপনাকে একখানা চিঠি লিখবো কিন্তু ঠিকানা জানতাম না।

সে কার দোষ ? তোমার চিঠিতে ঠিকানা দাওনি কেন ?

ভয় হ'য়েছিল রেগে আছেন।

তাই ঠিকানা না দিয়ে চিঠি লিখলে, পাছে ঠিকানা পেলে সশরীরে গিয়ে ব'কে আসি ?

ছায়া হাসিল। যে অন্ধকার একবার মুখের রক্তিমা আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এখন সেই অন্ধকারই হাসির টোল দুটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

সম্বলপুরে কে থাকেন ?

কাকা।

ওরা ওখানে রইলো ?

হাঁ, এখন কিছুকাল থাকবে।

তবে তুমি কোথায় চল্‌লে ?

কল্‌কাতায়, কলেজ খুলেছে খবর পেয়েছি।

তারপরে বলিল, আপনি তো আমার সব কথা টেনে বের ক'রে নিলেন। আপনার খবর তো কিছু বল্‌লেন না। কোথায় এসেছিলেন ?

চক্রধরপুরে।

হঠাৎ ?

এক রকম হঠাৎ বইকি।

কেন ?

নরসিংপুরে একা ব'সে কি করবো!

কবে এসেছেন ?

গত কাল।

সকালের গাড়ীতে ?

গাড়ীতে নয়, হেঁটে।

হেঁটে—ছায়া বিস্মিত হইয়া ওঠে, তারপরে আবার বলে—নরসিংপুর থেকে চক্রধরপুর যে অনেক দূর!

হাঁ, ষাট মাইলের উপর।

ক'দিন লাগলো ?

ছয় দিনের মতো।

আপনি খুব হাঁটতে পারেন দেখছি। কিন্তু হঠাৎ এমন অদ্ভুত শখ হ'লো কেন ?

শখের কি আবার কেন আছে ?

তবু।

মনে করো না কেন, তুমি পশ্চিমের দিকে গিয়েছ শুনে আমি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

ছায়ার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে, তবু জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করে—কেন?

বক্‌বার জন্যে।

দুইজনে হাসিয়া ওঠে।

তারপরে সঞ্জীব বলে, এই পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, শালবন, প্রান্তর আমার বড় ভালো লাগে।

ভালো-লাগার তালিকা যে মস্ত, আর কিছু থাকে তো শুনে নিই।

এই মাঠের পরে মাঠ, এই ধূসর পথের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া বড় ভালো লাগে।

আর কিছু?

সকাল সন্ধ্যার আকাশ, দুপুর বেলাকার তপ্ত রসের মতো রোদ সমস্তই।

আর কিছু ভালো লাগে না?

ছায়া যেন কি একটা শুনিতে চায়।

লাগে বই কি! তোমাকে খুব ভালো লাগে।

অন্তরের অসহ্য উল্লাস চাপিয়া রাখিয়া নির্ব্বিকার কণ্ঠে ছায়া শুধায়—আর কিছু নয়?

ছায়ার উদাসীন ভাবে সঞ্জীব অপ্রস্তুত হয়, সব ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলে, আর ভালো লাগে নিমবেগুন।

যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ওটা বেশি দুষ্প্রাপ্য নয়।

আগেরটা বুঝি খুব দুষ্প্রাপ্য?

কি সব বাজে বকছেন! ঐ যে লোকগুলো শুয়ে আছে শুনলে ভয় পাবে।

কেন?

ভাববে পাগলের সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠেছে।

তবে যাতে শুনতে না পায় সেই ভাবে বলি, বলিয়া সঞ্জীব উঠিয়া আসিয়া ছায়ার পাশে বসিল এবং দুরূহ অথচ অপ্রিয় কর্ত্তব্য সমাপনের ন্যায় এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, ছায়া আমি তোমাকে ভালোবাসি, খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।

আচ্ছা নিমবেগুনটা কি রকম পছন্দ করেন? খুব শুকনো না একটু ঝোল-ঝোল।

আহত হইয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইয়া শার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে চেষ্টা করে।

তাহার আহত ভাবে ছায়া উল্লাস অনুভব করে। তাহার চোখ দুটি চিন্তামণি লাভের আনন্দে ঝলমল করিতে থাকে। ঐ চোখ দেখিলে মুহূর্ত্তে সঞ্জীবের সন্দেহ নিরসন হইত। কিন্তু বেচারা সঞ্জীব হয়তো চোখের ভাষা পড়িতে জানে না। হয় তো এক পড়িতে আর পড়িত, ভাবিত তাহাকে আঘাত দিয়া ছায়া আনন্দ পাইয়াছে।

সঞ্জীব অনেকক্ষণ কথা বলে না দেখিয়া ছায়া শুধাইল—কোথাকার টিকিট কিনেছেন?

কল্‌কাতার কিনেছিলাম, কিন্তু ভাবছি নরসিংপুরেই নেমে যাবো।

তবে অগত্যা আমাকেও সেখানে নামতে হবে।

তা হলে আমি কল্‌কাতাই যাবো।

একবার কল্‌কাতা, একবার নরসিংপুর, দেখি আপনার কোথাকার টিকিট?

বলিয়া ছায়া তাহার বুক পকেটে হাত চালাইয়া দিয়া টিকিট তুলিয়া লইল।

দাও, টিকিট দাও।

সঞ্জীব কৃত্রিম কোপে তাহার হাত হইতে টিকিট কাড়িয়া লইল।

কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ছায়া দেখিয়া লইয়াছে টিকিট নরসিংপুরের।

বলিল, যান কল্‌কাতায়, টিকিট চেকারের হাতে পড়বেন।

আচ্ছা না হয় নরসিংপুরেই নাঁমবো, কল্‌কাতায় গিয়ে তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। হ'ল তো?

এই তো ভালো ছেলের মতো কথা। এবারে নামবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিন, নরসিংপুর এলো বলে।

এরই মধ্যে! এত শীঘ্র!

দুঃখ হচ্ছে? ভালো লাগার ফর্দে আরও কিছু আছে নাকি?

বাজে কথা রাখো—আমার প্রশ্নের উত্তর কি বলো।

এই দেখুন সুবর্ণরেখার সাঁকোর উপরে উঠেছি, এরপরে গালুডি, তার পরেই নরসিংপুর।

কিন্তু তার আগে?

তার আগে কি!

তোমাকে ভালবাসি, বলিয়া সঞ্জীব ছায়ার একখানা হাত ধরিয়া সবলে নিপীড়ন করিল।

ছায়া হাত সরাইয়া লইল না।

বলো—

সব কথার উত্তর কি মুখে বলা যায় ?

তবে ?

নরসিংপুরে ক'দিন থাকবেন ?

দু'চার দিনের বেশি নয়।

একটু সাবধানে থাকবেন কি ?

আমার প্রশ্নের উত্তর পেলে চেষ্টা করবো।

যে-কোন একটা উত্তর ?

না, আমার মনের মতো উত্তর।

এ-ও তো বড় জুলুম !

ছায়া হাসে, সঞ্জীবের গাম্ভীর্য্য আর ভাঙে না।

নরসিংপুরে গাড়ী থামিল।

আমার উত্তর কিন্তু পেলাম না, বলিয়া বিষণ্নমুখে সঞ্জীব নামিয়া পড়িল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছায়া বলিল, একটু সাবধানে থাকবেন কি ?

আমার মনের মতো উত্তর হ'লে থাকবো।

আচ্ছা তবে তাই থাকবেন—বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ছায়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে রুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় তাহার দুই চোখ ও কপোল ভাসিয়া গেল ! এমন উত্তুঙ্গ আনন্দের শিখরে এত জল কোথা হইতে আসিল ? তুষার বুঝি গলিয়াছে।

গার্ড গাড়ীর পিছনের লাল বাতিটি বিদায়লক্ষ্মীর অনামিকার অঙ্গুরীয়ের চুনিটির মতো অন্ধকারের মধ্যে নিঃশেষে যখন বিলীন হইয়া গেল তখন সঞ্জীব ষ্টেশন ছাড়িয়া বাসার দিকে চলিল।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া সঞ্জীব যখন ঘা দিল, ডাকিল, পাঁপড়ি দরজা খোল, তখনো ভোরের আলো ফোটে নাই।

২০

রাত্রি অন্ধকার। অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। নদীতে কলধ্বনি জাগিয়াছে। শালবনে হাওয়া উঠিয়াছে। ভেকের কোলাহলের স্থগিত লয়ের সঙ্গে ঝিল্লির একটানা তান ধ্বনিত হইতেছে। বৃষ্টির শব্দ, নদীর গর্জ্জন, হাওয়ার হাহাকার, ভেক ও ঝিল্লির ধ্বনিতে মিলিয়া চরাচরের নিদ্রার উপরে আর একখানি পুরু আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এত বিচিত্র শব্দসত্ত্বেও জগৎ নিস্তব্ধ।

নীলমণি খাঁচার কাঠের একখানি তক্তা আঁচড়াইতেছে। সে ভাবিতেছে তক্তাখানা ভাঙিবে না কি? আজ তিন চার রাত্রি তীক্ষ্ণ নখরে আঁচড়াইয়া তক্তাখানা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সাবধানে কাজ করা আবশ্যক। প্রথম রাত্রে আঁচড়ের শব্দ বোধ করি প্রবল হইয়াছিল। কে রে, বলিয়া বাদল লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অমনি নীলমণি ভালোমানুষটির মতো সেই তক্তাখানা চাপিয়া শুইয়া পড়িল। বাদল একবার এদিক ওদিক ঘুরিয়া 'শেয়াল' বলিয়া চলিয়া গেল।

তারপরে আরও দু'রাত নীলমণি ঐ তক্তাখানা আঁচড়াইয়াছে, তক্তা বোধ করি কমজোরি হইয়াও আসিয়াছে। কিন্তু পাছে দিনের বেলায় বাদলের চোখে পড়ে তাই ঐ তক্তাখানা চাপিয়া শুইয়া থাকে, নড়ে না। বাদল বলে, মরবে এবার।

বাদলের স্ত্রী বলে, মরলে চলবে কেন? জানোয়ারটা আছে বলে জল পাওয়া যাচ্ছে, নইলে আমাকেই তো টানতে হ'তো। তোমার আর কি?

বাদল বলে, মরলে আর কি করবো?

ওষুধ খাওয়াও, ডাক্তার ডাকো।

ইতিমধ্যে মুরলী আসিয়াছে যেমন প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসে। নীলমণি তাহাকেও ষড়যন্ত্র দেখিতে দেয় নাই, মুরলী অবশ্যই তাহাকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু সে তো সেই মানুষেরই জাত যাহারা তাহাকে খাঁচায় বন্দী করিয়াছে, কিম্বা মুরলী হয়তো আনন্দে এমনি চীৎকার করিয়া উঠিবে যে সমস্ত ধরা পড়িয়া যাইবে।

এমন সময়ে দিন দুই আগে বৃষ্টি নামিল, সারাদিন, সারারাত। দিনের বেলায় কাজ করিতে নীলমণির সাহস হয় না, কিন্তু রাত্রিটা অবাধে কাজ করিয়া যায়—বর্ষায় কেহ বাহির হয় না, তা ছাড়া বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দে নখের আঁচড়ের শব্দ চাপা পড়িয়া যায়।

সে আবার উঠিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে তক্তাখানা আঁচড়াইতে লাগিল, মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়া ঠেলে, বোধকরি একটু আল্‌গা হইয়াছে। সে এক একবার ভাবে নখগুলা গেল, মাঝে মাঝে অনুভব করে নখের গোড়া ভেজা কেন? রক্ত পড়িতেছে কি? নখই যাক্ আর রক্তই বাহির হোক, তক্তাখানা সে খুলিয়া ফেলিবেই। মুক্তি তাহার চাই-ই চাই।

কাজ করিতে করিতে তাহার মনে হয় মানুষ কি বোকা। তাহারা ভাবিয়াছে আমাকে বেশ আরামে রাখিয়াছে, না? পশুর মন সম্বন্ধে মানুষে কিছুই জানে না, নিজের মন দিয়া পশুমনের

বিচার করে। এমন সময়ে হঠাৎ তাহার মনে স্বপ্নের মতো সেই অরণ্য-স্বর্গের দৃশ্য জাগিয়া ওঠে, সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে লাগিয়া যায়।

হঠাৎ তক্তার খানিকটা অংশ খসিয়া পড়িয়া গেল, আনন্দে নীলমণি ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিয়া উঠিল।—এবারে একটু ধাক্কা, আর একটু। বাস্ বাস্—বাস্! বাকি অংশটুকু খসিয়া গেল—আর সেই সঙ্গে, সেই ধাক্কার বেগে সে খাঁচার বাহিরে আসিয়া পড়িল। কি একটা প্রাণী ছুটিয়া পালাইল, বোধ করি শিয়াল হইবে।

নীলমণি দেখিল তাহার পায়ে শিকল নাই, গলায় দড়ি নাই, খাঁচার বন্ধন নাই। কি মুক্তি, কি আনন্দ, দেশ কাল ভুলিয়া সেখানে একবার সে নাচিয়া লইল।

তারপরেই সম্বিৎ হইল আর মুহূর্ত্তকাল এখানে থাকা উচিত নয়। ধীরে ধীরে টিলার উপর হইতে নামিয়া নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং তারপরেই নদী-বরাবর পূর্ব্ব-সংস্কারের টানে কাছিমদহের দিকে চলিতে লাগিল।

কাছিমদহে মুরলীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে যখন নীলমণি আসিয়া উপস্থিত হইল তখনো রাত্রির অন্ধকার আছে। কিন্তু এ কি! বাড়ীর উঠানে এক কোমর জল কেন? আর জলে এত টানই বা কেন? জলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চ ডাঙা ও শুক্‌নো জমি সে খুঁজিতে লাগিল; এমন সময়ে পা ফসকিয়া গভীরতর জলে গিয়া পড়িল। সে দেখিল, ও বাবা এ যে সাঁতার জল! মন্দ কি, অনেক-দিন সাঁতার দেওয়া হয় নাই, খানিকটা সাঁতার দেওয়া যাক। তাহার ভারি মজা লাগিল।

অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া নীলমণি ক্রমেই গভীরতর জলে গিয়া পড়িতে লাগিল এবং অবশেষে অতি প্রচণ্ড স্রোতের মুখে গিয়া পড়িল। কয়েক দিনের বর্ষায় কোন্ পাহাড়ে অকাল বর্ষণ নামিয়াছে। তাহারই প্রবর্ত্তিত জলধারায় চোরা পাথর-সঙ্কুল, ঘূর্ণিভৈরব নদীগর্ভে স্রোত এমন মারাত্মক প্রবল হইয়াছে যে হাতীর পক্ষেও দুস্তর। নীলমণি হাঁসফাস করিতে লাগিল, হাবুডুবু খাইতে লাগিল, তার পরে তীরে উঠিবার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া ঝড়ের মুখে খড়কুটার মতো স্রোতের মুখে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। নীলমণি বুঝি মরিল।

২১

সঞ্জীব ছায়াকে কথা দিয়াছিল যে যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতায় ফিরিবে ও তাহার সঙ্গে দেখা করিবে।

ছায়া বলিয়াছিল, এবারে আর হেঁটে রওনা হবেন না, ট্রেনে চেপেই আসবেন।

সঞ্জীব বলিল—ট্রেনে! পাখী হলে উড়ে চলে যেতাম।

না, না, আর পাখী হ'য়ে উড়বেন না, কে কোথা থেকে আবার তীর মারবে।

তা'তে তোমার ক্ষতি কি?

আহা আমার ক্ষতি এমন কি বলেছি? আপনার ক্ষতি তাই মনে করিয়ে দিলাম।

আচ্ছা ভয় নেই, ট্রেনে ক'রেই ফিরবো, নরসিংপুরে দু'এক-দিনের বেশি বিলম্ব হবে না।

সঞ্জীব পাঁপড়িকে ছায়ার সম্বন্ধে কিছু জানায় নাই, শুধু বলিয়াছিল, ভালো লাগলো না, ফিরে এলাম রে। এখন দু'একদিনের মধ্যেই কল্‌কাতা ফিরবো।

এই বর্ষণটা থামুক দাদাবাবু, তারপরে যেয়ো।

তারপরে বলিল—এই বৃষ্টি কেটে গেলে দেখো এখানকার আকাশ কেমন পরিষ্কার হয়।

আচ্ছা না হয় তাই হবে, নরসিংপুরের মুখ অপ্রসন্ন থাকতে যাবো না।

আজ কয়েকদিন পরে বর্ষণ থামিয়া গিয়া নরসিংপুরের আকাশ এমন নির্ম্মল, গিরিশ্রেণী এমন উজ্জ্বল, বনরেখা এমন ঘনশ্যাম ও সমস্ত প্রকৃতি এমন স্নিগ্ধপ্রসন্ন, আর দগ্ধ প্রান্তরখানা আগাগোড়া কচি শস্পলেখায় এমন কোমল সবুজ হইয়াছে যে তেমন এক নরসিংপুরেই সম্ভব।

কি দাদাবাবু কোথায় চল্‌লে আবার?

শুনলাম নদীতে বান এসেছে, যাই একবার দেখে আসি।

তাহলে একেবারে কাছিমদ'র দিকে যাও, দেখবে বান কাকে বলে।

খুব তোড় নাকি?

তোড় ব'লে। একবার রাজার একটা হাতী ওখানে বানের মুখে পড়েছিল, একক্রোশ ভেটিয়ে গিয়ে উঠেছিল, আর একটু হ'লেই মরতো।

সেই ভালো, তবে কাছিমদ'র দিকেই যাই, বলিয়া সঞ্জীব রওনা হইয়া গেল।

সিকি মাইল দূর হইতে নদীর গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া সঞ্জীব বুঝিতে পারিল যে বন্যা সত্যই ভয়ঙ্কর নতুবা নদী এমন মুখর হইয়া উঠিত না। মুরলীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া সঞ্জীব দেখিল আঙিনা কর্দ্দমাক্ত, বুঝিল জল উঠিয়াছিল সবে নামিয়া গিয়াছে। নদীর দিকে তাকাইয়া দেখিল দুই তীরের গিরিসঙ্কটের কঠিন শিলায় জলরাশি আহত, প্রহত, মূর্চ্ছিত হইয়া, ডোবা পাথরের সংঘাতে মন্থিত, মন্দ্রিত, চূর্ণিত হইয়া গর্জ্জনে নর্ত্তনে তরঙ্গে ফেনোচ্ছ্বাসে এক ভৈরব বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে আর সেই সঙ্কীর্ণ সঙ্কট-স্থল অতিক্রম করিবামাত্র এপারে ওপারে বহুধা বিস্তৃত হইয়া গিয়া সেই উন্মত্ত জলধারা সবাহিনী চামুণ্ডার মতো একেবারে দুর্ব্বার গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। শব্দ এমন ভীষণ যে কোন কথা শোনা যায় না, নিজের মনের চিন্তাও যেন চাপা পড়িয়া যায়। সঞ্জীব তীরে দাঁড়াইয়া নদীর তাণ্ডবের তাল অনুভব করিতে পারিল, ডাঙা যেন কাঁপিতেছে।

এমন সময়ে সঞ্জীব দেখিল একটা লোক ছুটিয়া আসিতেছে। আর একটু কাছে আসিলে বুঝিল মুরলী। সে ভাবিল মুরলীর এমন আলুথালু পাগলের অবস্থা কেন ?

মুরলী কি হ'ল ?

মুরলী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, হুজুর আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, নীলমণি পালিয়েছে।

বিস্মিত সঞ্জীব শুধায়, পালিয়েছে ? নীলমণি ?

হাঁ হুজুর, বলিয়া সে বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি হয়েছে খুলে বলো।

আজ কারখানা থেকে ফিরছি এমন সময়ে বাদল ভাই এসে সম্মুখে দাঁড়ালো।

আমি বলি, কি বাদল ভাই, খবর ভালো তো?

ভালো আর কই! নীলমণি কাল রাতে পালিয়েছে।

নীলমণি পালিয়েছে! আমি ব'সে পড়ি। সে তো পালাবার নয় আমার নীলমণি।

সেইজন্যই তো বড় সাহেব বল্‌ল, যাও একবার মুরলীকে শুধিয়ে এসো।

না ভাই আমি তো কিছু জানিনে। চলো তো একবার দেখে আসি।

তখন বাদলের সঙ্গে গেলাম বড় সাহেবের বাংলোয়। দেখলাম খাঁচার একখানা তক্তা ভাঙা, সত্যি পালিয়েছে হুজুর।

বাদল বল্‌ল, নদীতে বানের মুখে পড়ে মরেছে।

আমি বল্‌লাম, ভাই নীলমণি আমার মরবার নয়, ও যদি যায় কাছিমদ'র বাড়ীর দিকে গিয়েছে, অমনি ছুটতে ছুটতে আসছি।

সঞ্জীব বলিল, আমি তো তোমার বাড়ীতেই গিয়েছিলাম কিছু চোখে পড়ল না।

আপনাদের চোখে পড়বে না হুজুর।

মুরলী বাড়ীর দিকে চলিল, কৌতূহলী সঞ্জীবও পিছু লইল।

বাড়ীর উঠানে পৌঁছিয়া মুরলী ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ডুবে মরেছে হুজুর, ডুবে মরেছে।

এই বলিয়া ইঙ্গিতে কতকগুলি নখের আঁচড় ও পায়ের ছাপ দেখাইল, এ সব আগে সঞ্জীবের চোখে পড়ে নাই।

শূন্য উঠানের মধ্যে দণ্ডায়মান মুরলীর বুক ফাটিয়া আর্ত্তনাদ বাহির হইল, নীলমণি রে!

সঞ্জীব বলিল, মুরলী তুমি পাগল হয়েছ, জানোয়ার কখনো ডুবে মরে? সাঁৎরে উঠবে।

এই তোড়ে হাতী ডুবে মরে হুজুর, নীলমণির সাধ্য কি!

ঠিক কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল।

মুরলীকে চলিতে উদ্যত দেখিয়া সঞ্জীব শুধাইল, কোথায় চল্‌লে?

আপনার কথাই ঠিক হুজুর, নীলমণি মরেনি, আমাকে ছেড়ে মরতে পারে না। যাই খুঁজে দেখিগে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল, সে যেখানেই থাকুক আমার ডাক তার কানে পৌঁছবেই, বলিয়া সে তীর বরাবর ছুটিতে লাগিল, হাঁকিতে লাগিল—নীলমণি রে—

কিছুক্ষণ পরে যখন সঞ্জীব তাকাইল, দেখিল সন্ধ্যার ছায়ায় মুরলীর দেহটা আর একটা ম্লান ছায়ার মতো ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

বিষণ্ণ মনে সঞ্জীব ফিরিল। মাঝে মাঝে তাহার কানে একটা বুকভাঙা স্বর আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—নীলমণি রে, নীলমণি।

২২

একবার জ্ঞান হয়, একবার লোপ পায়, এই ভাবে জ্ঞান ও মূর্চ্ছার মধ্যে দোল খাইতে খাইতে অবশেষে এক সময়ে নীলমণির অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান হইল। অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান কিন্তু বড় ক্ষীণ। তাহার চোখ, কান, নাক কিছুই স্থায়ীভাবে ধরিতে পারিতেছে না। কখনো মনে হয় আশেপাশে কতকগুলি কালো ছায়া, কখনো নাকে আসে অতি পরিচিত একটি ক্ষীণ সুগন্ধ, কখনো কানে আসে কত দিনের জানা মৃদু পদধ্বনি—সবই যেন জন্মান্তের। তাহার ধারণা হইল সে মরিয়া গিয়াছে আর মৃত্যুর পরে বহু দিনের স্বপ্নে-দেখা স্বর্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে চাহিয়া দেখিল গলায় কড়ির মালাটা নাই, মানুষের শেষ চিহ্ন কখন খসিয়া গিয়াছে। তাহার যে মৃত্যু হইয়াছে এ ধারণা তখন নিশ্চিত হইল, মানুষের চিহ্ন মৃত্যুর পরে কিরূপে আসিবে? সে একবার উঠিতে চেষ্টা করিল, দুর্ব্বল পা তাহাকে বহন করিতে পারিল না, সে পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া চোখ বুজিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বন্যার তোড়ে ভাসিয়া আসিয়া নীলমণি বনের প্রান্তে এক জায়গায় আটকাইয়া গিয়াছে।

এবারে তাহার নাকে সেই মিষ্ট সুগন্ধটি আরও উগ্রভাবে প্রবেশ করিল, কানে পরিচিত পদধ্বনি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল,

সে চোখ মেলিল, চোখের জ্যোতিও যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। সে দেখিল একদল ভালুক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কতক তাহার গা শুঁকিতেছে, কতক বা অমনি দণ্ডায়মান।

নীলমণি বুঝিল এ স্বর্গে আরও ভালুক আছে, তাহার বড় স্বস্তি বোধ হইল। এতক্ষণ নিজেকে একাকী ভাবিয়া বড় নিরানন্দ বোধ করিতেছিল। নিঃসঙ্গ স্বর্গ কি সুখকর!

একটা ভালুক পা দিয়া ঠেলিয়া তাহার সম্মুখে একটা মধুর চাক রাখিল। নীলমণি একবার ইতস্ততঃ করিল, বার দুই চাকখানা শুঁকিল, তার পরে টানিয়া চুষিয়া চুষিয়া মধু পান করিল। আঃ কি মধুর, মুরলীর ঘরেও সে অনেক বার চাকের মধুপান করিয়াছে কিন্তু ঠিক এমন মধুর নয়। মধু পান করিয়া সে অনেকটা বল পাইল। এবারে একটু চেষ্টা করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল, দেখিল আশেপাশে অনেকগুলি ভালুক। নরসিংপুরে থাকিতেও অনেক সময়ে সে ভালুক দেখিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কেমন যেন রুক্ষভাব, আর এ ভালুকগুলা কি পুষ্ট, তাহাদের গা কেমন মসৃণ, ইহাদের চোখগুলা কেমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। সে ভাবিল হইবে না কেন, মর্ত্ত্যের ভালুক ও স্বর্গের ভালুক তো এক রকম হইবার নয়। সে কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখিল যে বড় ভালুক, সবচেয়ে বড়টা চলিতে সুরু করিল, অমনি বাকিগুলাও সারিবদ্ধ ভাবে তাহার পিছু পিছু চলিল, নীলমণিও তাহাদের সঙ্গে চলিল সকলের পিছনে।

ভালুকের সারি মাঠ পার হইয়া বনে প্রবেশ করিল, বনের মধ্যে একটি খরস্রোতা ঝরণা। ঝরণা পার হইয়া ঘন শাল গাছে ঢাকা এক পাহাড়, সকলে পাহাড়ে উঠিল। পাহাড়ের অপর প্রান্ত

বাহিয়া সকলে নামিল। এমনি ভাবে পাহাড়ের পর পাহাড়, উপত্যকার পরে উপত্যকা, ঝরণার পরে ঝরণা পার হইয়া ভালুক-গুলা এক উপত্যকায় আসিয়া থামিল। নীলমণি দেখিল, বাঃ কি সুন্দর! কেমন নিরাপদ, কেমন নিভৃত।

নীলমণি দেখিল উপত্যকার চারদিকে পাহাড়, কোথাও ছেদ নাই; পাহাড়ের গায়ে নিবিড় শালবন, কোথাও ছেদ নাই; পাহাড়ের চূড়া, বনের মাথা সূর্য্যালোকের উজ্জ্বল পাগড়ীবাঁধা; মাথার উপরে গোলাকার ঐ আকাশখানায় কোথাও এতটুকু মেঘ নাই; আর নীচে উপত্যকায় কচি কোমল ঘাস, ঘাসের মাঝে মাঝে শাদা, নীল, লাল, হলদে হাজার হাজার ছোট ছোট ফুল, উপত্যকার প্রান্তে পাহাড়ের ঠিক তলাতেই কত যে গাছ, সব ফুলে ভরা, পলাশ, জারুল, গল্‌গলি, আরও কত কি। সবগুলার নামও সে জানে না, অনেকগুলাই আগে দেখে নাই, কেমন করিয়া জানিবে, কেমন করিয়া দেখিবে, স্বর্গের ফুল তো মর্ত্ত্যে নাই। দেখিল পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে এ ডাল হইতে ও ডালে কত রকম পাখী উড়িয়া যাইতেছে, কাহারো ঠোঁট লাল, কাহারো গা হলদে, কাহারো লেজ নীল। আর ঐ যে মস্ত পাখীটা বিচিত্র রঙের লেজে নানা রঙের চমক তুলিয়া শাখা হইতে মাটিতে নামিল ওটা কে সে চেনে। ওটা ময়ূর। নরসিংপুরে কত বার ময়ূর সে দেখিয়াছে। মর্ত্ত্যের কোন কোন পাখী স্বর্গে আছে ভাবিয়া সে বিস্ময় ও আনন্দ বোধ করিল।

ভালুকগুলা উপত্যকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, নীলমণিও থামিল, সেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে সব ভালুকগুলা সমস্বরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিয়া উঠিল, সেই ঐকতানে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠিল। এমন সময়ে সে দেখিল পাহাড়ের এক গুহা হইতে দুটি বড় ভালুক বাহির হইল—বাহির হইয়া তাহাদের দিকে আসিতে লাগিল। অন্য ভালুকগুলা সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। নীলমণি ভাবিল এরা আবার কে? স্বর্গের রাজা রাণী নাকি! সেই ভালুক দুটা আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নীলমণিকে নিরীক্ষণ করিল, তারপরে আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার আপাদমস্তক শুঁকিল। নীলমণি সারাক্ষণ বোকার মতো দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল এ আবার কি? তারপরে স্থির করিল ইহাই বুঝি স্বর্গের রীতি।

অবশেষে ভালুক দুটার সংশয় যেন ঘুচিল, তাহারা নীলমণিকে কয়েক বার প্রদক্ষিণ করিয়া পাশাপাশি বসিল। তখন সকলে মিলিয়া এক রকম অদ্ভুত শব্দ করিতে সুরু করিল, ভালুকের এ রকম শব্দ নীলমণি আগে শোনে নাই। সে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

তারপরে সকলে সেই বড় ভালুক দুটাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে সুরু করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত গুহায় গিয়া ঢুকিল, নীলমণিও সকলের পিছনে পিছনে ঢুকিল। নীলমণি দেখিল প্রকাণ্ড গুহা, কত প্রকাণ্ড বোঝা যায় না, পিছন দিকটা অন্ধকার। একদিকে একরাশ শুষ্ক ফল স্তূপীকৃত ছিল। সকলকে খাইতে দেখিয়া সে-ও খাইতে সুরু করিল। দু'এক গ্রাস খাইয়াই সে বুঝিল, এফল সে আগেও খাইয়াছে, মুরলী যখন তাহার উপরে খুশী হইত, খাইতে দিত শুকনা মহুয়া। সে ভাবিল, কিন্তু যাই বলো মর্ত্ত্যের ফলের তুলনায় এগুলা অনেক বেশি মিষ্টি।

ফলগুলা নিঃশেষ করিয়া যখন তাহারা বাহিরে আসিল, তখন উপত্যকার আকাশে মস্ত একখানা চাঁদ উঠিয়াছে। এমন সময়ে বড় ভালুক তুটার নির্দ্দেশে একটা ভালুক আসিয়া নীলমণির পাশে দাঁড়াইল। নীলমণি কেমন ভাবে যেন বুঝিল এখন হইতে সে তাহার সঙ্গে থাকিবে, বুঝিল এতদিন সে বেজোড় ছিল, এবারে জোড় মিলিল, স্বর্গে বেজোড় থাকিবার নিয়ম নাই।

নীলমণি ও তাহার সঙ্গিনীকে মাঝখানে রাখিয়া ভালুকগুলা চক্রাকারে দাঁড়াইল, তারপরে সকলে পিছনের তুটি পায়ে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রভুর গৃহে থাকিতে নীলমণি এ বিদ্যাটা বেশ শিখিয়াছিল, সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার সঙ্গিনীও দাঁড়াইয়াছে। অনেকগুলা মহুয়া ফল খাইয়া নীলমণি বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতেছিল, তারপরে সঙ্গিনীর স্পর্শে ও সান্নিধ্যে তাহার স্ফূর্ত্তি আরও বাড়িল, সমস্ত চরাচর তাহার কাছে রঙীন বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে বড় ভালুক তুটার ইঙ্গিতে সেই ভালুকচক্র নাচিতে সুরু করিল, তালে তালে তালে; তাহাদের পায়ের তলে শুষ্ক পাতার মঞ্জীর বাজিতে লাগিল তালে তালে তালে, বাতাসে গাছগুলার শাখা তুলিতে লাগিল তালে তালে তালে; পূর্ণ চন্দ্রের সঞ্চরণে বনের ছায়া পাশ ফিরিতে লাগিল তালে তালে তালে; ভালুকচক্রের কেন্দ্রে সঙ্গিনীর পাশে নীলমণি নাচিতেছে তালে তালে তালে। বাতাস বহিতেছে, কোকিল ডাকিতেছে, ঝরণার ঝঙ্কার চলিতেছে, শাল শিরিষের সুগন্ধ চন্দ্রাতপের তলে সূক্ষ্ম নকসা বুনিয়া দিতেছে, অটল নিস্তব্ধতা ক্ষণে ক্ষণে অস্ফুট কথা বলিতেছে আর তারি মাঝে নীলমণি ও তাহার সঙ্গিনী, আর

তারি মাঝে সেই চিক্কণ ভালুকচক্র নাচিতেছে তালে তালে তালে।

নীলমণি ভাবিতেছে একি স্বপ্ন না স্বর্গ! পাশে সঙ্গিনীকে দেখিয়া বুঝিতেছে স্বপ্ন নয়—স্বর্গ। সঙ্গিনীর মদঘূর্ণিত চক্ষু দুটি দেখিয়া ভাবিতেছে স্বর্গ কি মধুর। কিন্তু এত সুখের মধ্যেও নাচিতে নাচিতে হঠাৎ এক একবার সে উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে, দূরশ্রুত প্রতিধ্বনির মতো কানে আসে একটি আর্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর—নীলমণি রে! ওবে আমাব নীলমণি। তাহার তালভঙ্গ হইয়া যায়—তখন সঙ্গিনী থমকিয়া দাঁড়াইলে তাহার হুঁস হয়, আবার নাচিতে সুরু করে, কিন্তু কিছু পবেই আবার তালভঙ্গ হয়, কানে আসে অতি পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর, অতি ব্যাকুল প্রয়াসে ডাকিয়া মরিতেছে, নীলমণি রে, তুই কোথায় গেলি বাবা?

নীলমণির চোখে সব ঝাপসা বোধ হয়, সব শূন্য ঠেকে, সে ভাবে স্বর্গেও তবে দুঃখ আছে নাকি? না, ওটা মর্ত্যের দুঃখেরই জের? কিছুই বুঝিতে পারে না, বুঝিবাব সময়ও পায় না, সঙ্গিনীর খোঁচায় তাল সামলাইয়া আবার নাচে মন দেয়। তবু ক্ষণে ক্ষণে সিক্ত সজল পূবে হাওয়ার মতো ঐ কাতর করুণ কণ্ঠ তাহার মনে আঘাত করিতেই থাকে—ওরে আমার নীলমণি ফিরে আয়—

নীলমণি ভাবে স্বর্গও বুঝি তবে সম্পূর্ণ স্বর্গ নয়।

সমাপ্ত